লালবাবুর লাস

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মানিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

এক টাকা

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

বৈশাখ, ১৩৫৫

দুর্জ্জয় কিশোর গ্রন্থমালা ঃ-

১। পাতালের পাকচক্র

২। ওঙ্কারের টঙ্কার

৩। কালপুরুষ ডাঃ কিউ

৪। ব্লাড-ব্যাঙ্কার

৫। লালবাবুর লাস

লালবাবুর লাস

নীচে নামবার ঐ একটা মাত্র পথ।

নামতেই হবে, নইলে লালবাবুর সন্ধান করা হয় না। লালবাবু আজ পাঁচদিন হোল বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ, এবং অমর জানে, কোথায় লালবাবুকে রাখা হয়েছে—জীবিত নয়, তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করে রাখা হয়েছে এই পাহাড়ের নীচের গুহাতে। সে গুহা কি ভয়ঙ্কর, তা জানে অমরনাথ—, কয়েকদিন আগেই সে নিজে ঐ গুহাতে বন্দী হয়েছিল। অতখানি বিপদের মধ্যে আবার ফিরে আসতে ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু অমর বরাবর একরোখা, আর লালবাবু লোকটিকে ওর খুবই ভাল লেগেছিল; তাই তাঁর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে হত্যাকারীদের ধরিয়ে দেবার চেষ্টাতেই সে এখানে এসেছে আজ। স্থানটা বিন্ধ্যাচলের পার্ব্বত্য উপত্যকা, রাত দুটো—গভীর অন্ধকার। অমরনাথ একাই নেমে গেল সিড়ি দিয়ে।

উপর থেকে ক্রমনিম্ন হয়ে চলে গেছে পথ—বেশ চওড়া পরিষ্কার পথ। অমর কয়েকদিন পূর্ব্বে এই পথে দুবার

উঠানামা করেছে, তাই পথটা তার জানা।* কিন্তু সেদিন ছিল এখানে মানুষ, আজ যেন গুহাটা পরিত্যক্ত। কতকালের পুরানো একটা কয়লাখনির মত পড়ে আছে গুহাটা। অমরনাথ চিরদিনই নির্ভীক,—আজ কিন্তু ওরও ভয়-ভয় করতে লাগলো —ভূতের ভয় নয়,—আকস্মিক কোনো রকম বিপদের ভয়।

টর্চ্চ টিপে আলো জ্বালালো অমরনাথ। রাস্তাটা ঠিকই আছে—সেই ভাঙা টবগাড়ীটাও পড়ে রয়েছে—কিন্তু কোথাও মানুষের কোনো রকম সাড়া নেই—অবাক কাণ্ড! এতবড় একটা গুপ্ত আড্ডা, এমন ঐকটা ল্যাবরেটরী আর মানুষের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে আধমরা মানুষগুলোকে রাখবার এমন সুন্দর মর্গ ওরা কেন ছেড়ে দিয়ে গেল অকস্মাৎ? অমরনাথের ভয়েই না কি? হবে। মীনুকে ঐ মর্গ থেকেই উদ্ধার করেছিল অমর কয়েকদিন পূর্ব্বে। আজ সে এসেছে লালবাবুর লাস উদ্ধার করতে। কিন্তু অমর আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো যে-স্থানটাতে লালবাবুর মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়েছিল, সেই গর্ত্তটা খালি—শুধু কম্বলখানা পড়ে আছে, আর একটা কি জিনিষ, অমরের হাতের টর্চ্চের আলো লেগে ঝিক-মিক করছে। কি ওটা? অমর গিয়ে তুলে দেখলো—একটী আংটি, হীরা বসানো মূল্যবান আংটি—হয়তো লালবাবুর।

আংটিটি লালবাবুর হাত থেকে কোনো রকমে খুলে পড়ে গেছে বোধ হয়। কিন্তু এমন দামী আংটির কোন খোঁজই

* ব্ল্যাড্ ব্যাঙ্কার পড়।

কেন করলো না ডাকাতরা? আশ্চর্য্য তো! অমরনাথ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো আংটি হাতে নিয়ে। টর্চ্চ নিবিয়ে দিয়েছে; গুহার মধ্যে গভীর অন্ধকার যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। —প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট ভেবেও কোনো কিনারা করতে পারলো না অমর—অথচ ওর গোয়েন্দা-মনোবৃত্তি আংটি সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা করছে—কিন্তু অনুমানের উপর কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করা গোয়েন্দার উচিত নয়, ভেবে অমর আংটিটি পকেটে ফেলে মর্গটা দেখবার জন্য এগুলো। অন্ধকার ঠেলে যেন যেতে হচ্ছে অমরনাথকে। রাস্তাটা সোজা এবং অমরের চেনা আছে, তাই মাঝেমাঝে টর্চ্চ নিবিয়ে আবার জ্বেলে অমর ঠিকই চলতে লাগলো। প্রকাণ্ড সেই গেট্‌টার কাছে এসে টর্চ্চ জ্বেলে দেখলো, গেট খোলা—ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। অদ্ভুত সাহসী অমর তবু থমকে দাঁড়ালো আধমিনিট। এই মর্গ থেকে সে মীনুকে উদ্ধার করেছে মাত্র চারপাঁচ দিন আগে—কে জানে আরো কেউ এখানে অর্দ্ধমৃত হয়ে পড়ে আছে কিনা! কিন্তু চিন্তা করা বৃথা—অমর যখন এতটা এসেছে, তখন সবটাই দেখে যাবে। নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়লো অমর। খানিকটা আসতেই গলিত শবের দুর্গন্ধে ওর নাক জ্বালা করে উঠলো—তাহলে নিশ্চয় কোনো মৃতদেহ পচে গেছে এখানে। হয়ত রক্ত বের করে নেওয়ার পর তাকে আরোগ্য করে তুলবার সময় পায় নি ডাকাতগুলো—ব্যাপারটা ভাল করে জানতে হবে।

অমর নাকে রুমাল চেপে এগিয়ে চললো। প্রথম দিকের দশ-পনরটা শেল শূন্য—তার পর একটা শেলের মধ্যে দেখতে পেল, বীভৎস দৃশ্য—একটা মানুষ মরে পড়ে আছে—দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে—হাতদুটো শুকিয়ে শক্ত হয়ে যেন যুদ্ধের ভঙ্গীতে পাঁয়তাড়া কষছে। অন্য যে কেউ হলে সে-ভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে হয়তো মূর্চ্ছা যেত, কিন্তু অমর সে-ধাতুতে গড়া নয়। ও আরো এগিয়ে চললো। পথের দু'পাশে অগণ্য শেলে অসংখ্য মড়া অমনি ভাবে মরে পড়ে আছে। সংখ্যা শতাধিক! উঃ! এতগুলো লোককে হত্যা করেছে পাষণ্ডরা! পাহাড়ের নীচের এই গভীর গুহায় ওদের মৃতদেহের কোনো খোঁজই হবে না—এই ধারণা দস্যুদের; কিন্তু ঈশ্বর আছেন—অমর ওদের নিশ্চয় ধরবে এবং ফাঁসিকাঠে লট্‌কাবে।

অমর আরও এগিয়ে চললো। গুহার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত সে দেখবে। কিন্তু গুহাটা ক্রমশঃ সরু হতে হতে একেবারে শেষ হয়ে গেছে—ওদিকে যাবার আর রাস্তা নাই। অতএব অমর ফিরলো। হাতের টর্চ্চখানা নিবিয়েই হাঁটছে—ভাবতে ভাবতে। এখন এখানে কোনো লোক নাই, কিন্তু যদি কেউ থাকে—বা যদি কেউ হঠাৎ এসে পড়ে আর ওর হাতের আলো দেখতে পায়, তাহলে বিপদ ঘটতে পারে। অমরের সতর্ক মন প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা করছিলো। ঘটলও তাই। মর্গ থেকে ফেরার সুড়ঙ্গ-পথে খানিকটা এগিয়েই অমর দেখতে পেল—খানিক আগে যে মৃতদেহগুলো সে

দেখেছে—কে একজন লোক একটা উজ্জ্বল আলো হাতে সেখানে কি যেন খুঁজছে। অমর অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দেখতে লাগলো। চল্লিশ পঞ্চাশটা লাস দেখলো লোকটি, তার মধ্যে একটা লাসের কাছে এসে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো—দূর থেকে অমর দেখছে, সেই লাসটা তখনো শক্ত হয় নি। হয়তো এখনো ওর মধ্যে প্রাণশক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে—এখনো ওকে বাঁচানো যেতে পারে।

লাসটি বেশ করে দেখে লণ্ঠন হাতে লোকটি পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করলো,—লণ্ঠনের আলোতে সেটা পড়লো—হয়তো দ্বিতীয়বার পড়লো চিঠিখানা—কারণ, অমর দেখতে পেল চিঠির খামটা আগে থেকেই ছেঁড়া হয়েছিল। চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে লোকটি লাসটা আবার দেখলে—তারপর সেই শেলের নম্বরটা ভাল করে দেখে নিল—তার পরই হনহন করে চলে গেল বেরিয়ে যাবার পথে। অমর এবার নিশ্চিন্তে বেরুতে পারবে, কিন্তু, অমরের ভাগ্যটা বরাবরই একটু বাঁকা মতন—লণ্ঠনহাতে লোকটা বেরিয়ে যাবার সময় ফটকটা বন্ধ করে চাবি এঁটে দিয়ে গেল। অমর এখন সেই গলিত দুর্গন্ধ মৃতদেহগুলোর সঙ্গে বন্দী।

মুস্কিলে অমর বহুবার পড়েছে আর নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সেই বিপদ থেকে মুক্তও হয়েছে,—কিন্তু আজ এই গলিত দুর্গন্ধি মর্গএ ওর দম যেন আট্‌কে আসতে লাগলো। জীবন্ত মানুষ এখানে ঘণ্টা চার-পাঁচ থাকলে নিশ্চয় এই বিষাক্ত বাতাসেই মরে যাবে।

কিন্তু অমর অত সহজে মরবার জন্য জন্মায় নি। সে বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা হবে—এ খবর তোমরা নিশ্চয় জান; কবে হবে, তা অবশ্য অমর নিজেই জানে না, কিন্তু হবে। অমর ভালভাবে লক্ষ্য করেছিল, কোন্ শেলের লাস পরীক্ষা করলো ঐ লণ্ঠন-ওয়ালা। ওখানে কার মৃতদেহ রয়েছে দেখতে হবে, ভেবে অমর এগিয়ে এল অন্ধকারের মধ্যেই। আন্দাজ করে হেঁটে এসে শেলের সামনে দাঁড়িয়ে টর্চ টিপলো—একটি বছর পনের-ষোলো বয়সের মেয়ের মৃতদেহ। ঠিক মীণুর মতই বয়স হবে—হয়তো একআধ বছরের বড়ও হতে পারে। অমর শেলে ঢুকে দেখলো, মেয়েটির হাত-পা হিম-শীতল, কিন্তু সারা দেহটি বেশ নরম। মরণের পরই মানুষের দেহ শক্ত হয়ে যায়—এর যখন তা হয় নি, তখন বোঝা যাচ্ছে, মরে নি। ওষুদের গুণে মৃতকল্প করে রাখা হয়েছে—এই ব্যাপারটা কয়েকদিন পূর্ব্বেই অমর দেখে গেছে এখানে—।

ওকে আবার বাঁচিয়ে তুলবার ওষুদও সংগ্রহ করা আছে অমরের কাছে, কিন্তু সে ওষুদ আছে ওর বাড়ীতে, কলকাতায়। অমর ভাবতে লাগলো, কি সে করবে মেয়েটি সম্বন্ধে। কিন্তু

ওর মনে হল,—এতগুলো মৃতদেহের মধ্যে এই মেয়েটির দেহই যখন পরীক্ষা করলো সেই লণ্ঠন-হাতে লোকটি, তখন, নিশ্চয় সে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করবে এর সম্বন্ধে। সে আবার এখানে ফিরে আসবে—এ বিষয়ে অমরের সন্দেহ নেই, কিন্তু কখন, কত ঘণ্টা পরে ফিরে আসবে, তাতো জানা যাচ্ছে না—ততক্ষণে অমর এই মহাশ্মশানে বেঁচে থাকবে কি করে? দুশ্চিন্তায় অমরের কপালে ঘাম দেখা দিল, হাতের টর্চ্চটা নেবাতে ভুলে গেছে সে; ঐ আলোতেই দেখতে পেল,—লণ্ঠন-হাতে লোকটি যে চিঠিখানি পড়েছিল এখানে, সেটা ভুল করে ফেলে গেছে। মহামূল্যবান রত্ন যেন পেয়েছে, এমনি আগ্রহে চিঠিখানা তুলে নিল অমরনাথ। পড়তে লাগলো :—

প্রিয় জাগুয়ার,

আরোগ্য নিকেতনের মর্গের ছত্রিশ নম্বর শেলে যে মেয়েটির মৃতদেহ আছে—আগামী কাল বেলা নটার মধ্যে তার বাঁহাতে এক নম্বর ইন্‌জেকসন, তার পর পাঁচ মিনিট পরে দু নম্বর ইন্‌জেকসন দিতে হবে। ওর দেহখানা তুলে আনতে আমাদের ভুল হয়েছে—ওকে মরতে দেওয়া হবে না, ওর জীবনের দাম কয়েক লক্ষ টাকা—ওকে বাঁচিয়ে তুলে আমাদের জব্বলপুরের আস্তানায় আনবে; বাকী ব্যবস্থা আমরা করবো।

ইতি···বিবি!

মঙ্গলবার·· ৬ই আশ্বিন, ১৩৫৪

বেলা দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

অমর চিঠিখানা পড়ে অনেক কিছুই বুঝতে পারলো—কিন্তু অনেক কিছুই বুঝতে পারলো না। কে মেয়েটি, কার মেয়ে,—এ প্রশ্নের কোনো উত্তর তো পেলই না—মেয়েটিকে আবার বাঁচিয়ে জব্বলপুরের কোন্ আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হবে, তাও জানতে পারলো না অমর। লণ্ঠন হাতে লোকটার নাম জাগুয়ার—ওকে চেনে অমর; বেলেঘাটায় ওদের আড্ডায় ওকে দেখেছিল—মনে পড়েছে এবার। এখন অমর করবে কি? ঘড়ি আনে নি অমর; রাত কতখানা আছে জানতে পারছে না। আগামী কাল অর্থাৎ বুধবার বেলা ন'টার মধ্যে নিশ্চয় জাগুয়ার আবার আসবে এবং মেয়েটিকে ওষুদ দিয়ে বাঁচাবে—কিন্তু ততক্ষণ অমর এখানে নিজে বেঁচে থাকবে কি করে, সেইটাই ভাবনার কথা।

হাতের টর্চ্চ নিবিয়ে অমর ভাবতে লাগলো। আলো জ্বালাতে ওর ভয় করছে, কারণ জাগুয়ার যদি এসে পড়ে আর দেখতে পায় যে এই গুপ্ত সুড়ঙ্গে আলো হাতে কোনো লোক আছে, তাহলে অমরকে ধরে মেরে ফেলতে তার তিল-মাত্র দেরী হবে না। অবশ্য অমরের কাছেও তার অটো রিভলভার আছে, কিন্তু কে জানে জাগুয়ারের দলে এখানে কতকগুলো লোক। অতএব অমর নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো সেই মৃতদেহ বিকীর্ণ শ্মশানে।

ধীরে ধীরে পায়চারী করছে অমর সুড়ঙ্গটার মধ্যে। দুপাশের অগণ্য শেলে অসংখ্য মৃতদেহ পচে গিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে।

আর কেউ হলে তো ভূতের ভয়েই সাবাড় হয়ে যেত। অমর পায়চারী করতে করতে সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তের দিকে আবার এগুলো—দরজা নেই ওদিকে ; সেটা এর পূর্ব্বেই দেখে এসেছে। ওদিকে সুড়ঙ্গটা ক্রমোচ্চ হয়ে উপরদিকে উঠেছে—তারপর ক্রমশ সরু হতে হতে পাহাড়ের গায়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। দেখলে মনে হয় যেন কোন এক সময় পাহাড়টার ঐ অংশ ফেটে গিয়ে ঐ সুড়ঙ্গ তৈরী হয়েছে। অমর শেষ প্রান্ত অবধি হেঁটে উঠে এল—একেবারে সরু নালার মত ; মানুষ ঐ পথে যেতে পারে না।—কিন্তু কি যেন একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নদীর জলস্রোতের মত। উপরে কি ঝরণা আছে? কৈ? অমর এখানে কোনো ঝরণা বা নদী তো দেখে নি। হয়তো বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, এইটা তারই শব্দ—কিন্তু বৃষ্টির শব্দ এতনীচে এত স্পষ্টভাবে শোনা যাবে—এটা যে অসম্ভব! তাহলে কি এটা?

অমর কিছুই ঠিক করতে পারলো না—কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে ভাবতে হোল না—অমরের পায়ে জল লাগলো—সর্ব্বনাশ ব্যাপার! ঐ ফাটল দিয়ে হু হু করে জল ঢুকতে আরম্ভ করেছে ; টর্চ্চ টিপে না দেখলে অমর নিশ্চয়ই টের পেত না—কী ভয়ঙ্কর তোড়ে ঢুকছে জল। ঘণ্টা কয়েক এভাবে জল ঢুকলে এখুনি সমস্ত গুহাটা ভর্ত্তি হয়ে যাবে। মর্গের সব মড়াগুলো, তার সঙ্গে অমরও জলের নীচে এই গুহার অন্ধকারে চির-বিশ্রাম লাভ করবে। এখন উপায়? অমর প্রায় ছুটতে ছুটতে

ভিতর দিকে ফিরতে লাগলো। কিন্তু ফিরে সে যাবে কোথায় ? ওদিকের গেট বন্ধ। অমরের মৃত্যু আজ অবধারিত। সেই মেয়েটির শেলের কাছাকাছি ছুটে এসে অমর দাঁড়িয়ে পড়লো ;—উপায় নাই ; গেট বন্ধ।

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা অমরের স্বভাব নয়। প্রত্যেকটা শেল সে দেখতে লাগলো—যদি কোথাও কোনোদিকে বেরুবার পথ থাকে। না, পাথরের দেওয়াল কেটে ছোট কুট্রীর আকারের শেল তৈরী করা হয়েছে ; সেখানে একটু ফাটলও নেই। অমর প্রায় নিরাশ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ছে এবার। ওদিকে পাহাড়ের সেই ফাটল থেকে সজোরে জল নেমে আসছে—ঘণ্টা দুইএর মধ্যেই নিশ্চয় সব গুহাটা ডুবে যাবে। আত্মরক্ষার সব আশা তিরোহিত হয়ে গেল। এখানেও পায়ের তলায় জল লাগলো এবার দুইঞ্চি, চার ইঞ্চি—জল ক্রমশ বাড়ছে। অমরনাথ ঈশ্বরকে স্মরণ করলো।

অকস্মাৎ গেটের দিকে তালা খোলার শব্দ—অমর চেয়ে দেখলো, আলো হাতে জাগুয়ার গেট খুলছে। জলের উচ্চতা এখন প্রায় ছয় ইঞ্চি, গেট অবধি চলে গেছে জল। জাগুয়ার তাই দেখে—'ওরে সর্ব্বনাশ'—বলে—গেটটা বন্ধ না করেই ছুটে আসছে। অমর ত্বরিতে সরে গেল একটা শেলের মধ্যে। জাগুয়ার কোনো দিকে না চেয়ে সটান ছুটে এল মেয়েটির শেলের কাছে—জল এবার শেলের মেঝেতে উঠবে। জাগুয়ার

তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে কম্বল সমেত জড়িয়ে নিচ্ছে—অমর এই সুযোগে খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—ছুটে এসে দাঁড়ালো সেই গোলাকার চানকে। ওখানে অন্য একজন লোক আলো হাতে বসে রয়েছে, অমরের হাতের টর্চ্চ নেবানো—অমর চানকে আলো দেখেই আর না এগিয়ে সুড়ঙ্গমুখে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়লো। চানকে-বসে-থাকা লোকটা ওর ছুটে আসার শব্দ শুনতে পেয়েছে, শুধুলো—এনেছো মেয়েটাকে ?

অমর স্বর বিকৃত করে বললো,—না, একা আনা যাচ্ছে না, বড্ড ভারী মেয়েটা। একটু এসে ধরলে ভাল হয়। শীঘ্রী···শীঘ্রী !

—চলো—বলে লোকটা আলো না নিয়েই উঠে ঢুকলো এসে সুড়ঙ্গে—পথ যেন তার একান্ত পরিচিত—হনহন করে চলতে লাগলো।—অন্ধকারে অমর পাশ কেটে ওর পিছনে পড়লো ইচ্ছে করে। লোকটা কোনো দিকে না চেয়ে সোজা সাম্‌নে হেঁটে যাচ্ছে—অমর হঠাৎ পিছনে দাঁড়িয়ে গেল।

দূরে দেখা যাচ্ছে, আলো হাতে সেই জাগুয়ার, বোচকার মত করে মেয়েটাকে ঝুলিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে—যেন ছুটছে। দ্বিতীয় লোকটা কাছাকাছি যেতেই বললো,—তুমি আবার কেন এলে ডাক্তার ? চল, পালিয়ে চল। উপর থেকে ঝরণার জলের মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে ; এখুনি এই গুহার সমস্তটা ডুবে যাবে—চল।

—কিন্তু তুমিই তো আমায় ডাকলে এখুনি।

—সে কি ? আমি তো তোমাকে বসতে বলে মেয়েটাকে নিতে এখানে এসেছি—কখন আবার তোমায় ডাকতে গেলাম !

—ডাকলে—তুমি না হও, আর কেউ ডেকেছে—বলে ডাক্তার যেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

—ভূতে ডেকেছে। ও তোমার মনের ভুল—চল—দেখছোনা, পিছনে জল !

—ভুল নয়—সেও আমার পিছনেই আসছিল ; আমাকে এগিয়ে দিয়ে সে ওদিকে পালিয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আগে থেকেই সে ছিল এই গুহাতে—!

—কে সে ?—জাগুয়ার যেন গর্জন করে উঠলো !

—তা কেমন করে জানবো ? তবে সে একজন মানুষ, আর খুবই চালাক মানুষ ; তোমার গলার স্বর অনুকরণ করে আমাকে ডাকলো—বললো, মেয়েটা বড্ড ভারী, একটু ধরলে ভাল হয়।—উপরের রিজার্ভ-ট্রাঙ্কের জল খুলে দেওয়া হবে আজ রাত দুটোর সময়—আমি জানি, তাই ডাক শোনা মাত্র চলে এলাম, কারণ এখন দুটো বেজে পঞ্চাশ মিনিট। আর ঘণ্টাখানেক পরে এই মর্গের সমস্তটাই জলে ভর্ত্তি হয়ে যাবে। —এদিকে হাঁটু অবধি জল উঠে গেল। চল—চল—সে যে হয় হোক-গে। আগে নিজেরা বের হই।

বলে জাগুয়ার আগে আগে হাঁটতে লাগলো। অমরনাথ ওদের কথাগুলো শুনলো দূরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আর

বেশিক্ষণ দাঁড়ালে ওকে ধরা পড়তে হবে ; কাজেই সে আবার ছুটে এলো চানকের সেই গোলাকার যায়গাটায়। ডাক্তারের লণ্ঠনটা সেখানে জ্বলছে। অমর ওটা ছুঁলো না—ওখানটা পার হয়ে ক্রমোচ্চ রাস্তা ধরে অনেকদূর উঠে এলো। গভীর অন্ধকার ; অথচ টর্চ্চ জ্বালার উপায় নাই। অমর একটু দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখলো, বহু নীচে ডাক্তার আর জাগুয়ার আসছে। ওদের দুজনার হাতে দুটো লণ্ঠন। জাগুয়ারের কাঁধে সেই মেয়েটির দেহ। কিন্তু ওদের কথা আর শোনা যাচ্ছে না। অমর তাদের ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে। ওরা কি কথা কইছে, শোনার জন্য অমরের আগ্রহ অবশ্য খুবই হচ্ছে, কিন্তু সেটা আর সম্ভব নয়। তবু অমর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

ওরা ক্রমশঃ উঠে আসছে ; এতক্ষণে দু'একটা স্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে ওদের। জাগুয়ারের মোটা গলা শোনা গেল ;

—দশলাখ না হোক—আট লাখ নিশ্চয়।

—লাখ পাঁচেক!···ডাক্তারের সরু মেয়েলী গলা।

—বিবি অত সহজে রাজি হবে না!

—ওর বেশি পাবার আশা নেই !

—দেখা যাক !

অমর আর অপেক্ষা করতে পারে না। ওরা কাছে এসে পড়েছে। সে উঠে চলে এল ওপর দিকে। একেবারে শেষ সীমায় এসে দেখলে, একটা হাতল। ওটা ধরে টান দিলেই পাহাড়ের গায়ে পাথরের দরজা খোলা হয়ে যায়। অমর সে

কৌশলটা জানে। দরজা খুলে সে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে কি ভাবে আবার ওটা বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়, অমরের জানা নেই। ডাক্তার আর জাগুয়ায় এখুনি বেরুবে এই পথে। ওরা দরজা খোলা দেখে নিশ্চয় হকচকিয়ে উঠবে।* মজাই হবে। ওরা কোথায় যায়, দেখবার জন্য অমর বাইরে বেরিয়ে—একটা ঝোপের আড়ালে বসে রইল। দুঘণ্টা বসে আছে অমর, কেউ এলনা।

উঁচু পাহাড়ের আড়াল থাকায় সূর্য্যের আলো আসতে দেরী হলো, বলে অমর জানতে পারে নি যে অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গেছে। ওর জেদ বেড়ে গিয়েছিল—জাগুয়ার আর ডাক্তার নিশ্চয় এই পথেই বেরুবে, তখন তাদের ধরতে পারবে অমর। কিন্তু কোথায় তারা? এতক্ষণ ধরে অমর বৃথাই অপেক্ষা করলো ঐ উপত্যকার মত যায়গায় বসে। ওরা তাহলে গেল কোন্ দিকে।

যাবে আর কোন্ দিকে: এখনো নিশ্চয় এই গুহাতেই আছে, দেখতে হচ্ছে—ভেবে অমর আবার ঢুকে পড়লো গুহার মধ্যে। খানিকটা গিয়েই ঢালু রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়ে অমর সোজা ফোকাশ করলো তার টর্চ্চের। দূরে—বহু দূরে আলোর শেষ রশ্মি চিকচিক করছে। কি ওটা। জলটা অতখানা উঠে এসেছে এর মধ্যে? হ্যাঁ—জলই। আরো

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই এই গুহার সমস্তটা নিশ্চয় ডুবে যাবে, এবং তারপর পৃথিবীর মানুষের কাছে যুগযুগান্তের জন্য গুপ্ত হয়ে যাবে। যারা ঐখানে কবরস্থ রইল, তারা রয়ে গেল শতশত বছরের মত। উঃ! কি নৃসংশ এই ডাকাতগুলো!

অমর আর নামলো না—কারণ জল যে ভাবে উপরদিকে উঠছে, তাতে বোঝা যায়, গুহাটার সমস্তটা পূর্ণ হতে খুব বেশী দেরী নেই। কেন আর অনর্থক বিপদে পড়তে যায় অমর! সে আবার বেরিয়ে এল। লালবাবুর লাস উদ্ধারের আর কোনো আশাই নেই!

কিন্তু সেই জাগুয়ার আর ডাক্তার গেল কোন্ দিকে। নিশ্চয় অন্য কোনো দিকে পথ আছে, যেদিক দিয়ে ওরা উপরে উঠে গেছে। কোন্খানে সেই পথের মুখ—অমরকে আবিস্কার করতে হবে। অমর এই সব ভাবতে ভাবতে পাহাড়ের উপর উঠে এল।

সকালের আলোয় চারদিক বেশ দেখা যায়, কিন্তু জঙ্গল—বনভূমি পাহাড়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কে জানে, কোথায় কোন্ ঝরণা বা নদী থেকে জল ঢুকিয়ে ঐ গুহাটা চিরকালের মত ভর্ত্তি করে দেওয়া হোল। ওটা না খুঁজলেও চলবে, এখন দ্বিতীয় দরজাটা, যে পথে জাগুয়ার আর ডাক্তার গুহা থেকে বের হয়েছে, সেই গুপ্ত পথটা বের করতে হবে—তাহলে অর্দ্ধেক রহস্যের কিনারা হয়ে যায়!

জাগুয়ারকে লেখা বিবির চিঠিখানি অমরের পকেটেই

আছে! যে মেয়েটিকে ওরা গুহা থেকে উদ্ধার করলো, তার দাম দশ লক্ষ টাকা—অন্ততঃ আট লক্ষ। কে ঐ মেয়েটি? কার মেয়ে! ওকে যদি অমর উদ্ধার করে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিতে পারে তাহলে অমরই তো দশলক্ষ টাকা পেয়ে যায়···অমরের চোখ জ্বলছে লোভে। কিন্তু অত সোজা হবে না। ঐ ডাকাতগুলো যে কতখানা শয়তান, তা তাদের ব্লাড়-ব্যাঙ্কের ব্যাপার থেকেই বুঝেছে অমরনাথ। কিন্তু নিরাশ হবার মত ছেলেও নয় সে—দেখা যাক—ভেবে চলতে লাগলো পাহাড়ি পথ ধরে। কিন্তু কিছুদূর এসেই পথটা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে! মহা-মুস্কিলে পড়ে গেল অমর। এই একান্ত অপরিচিত পাহাড়ে বনের মধ্যে পথ হারালে শেষে কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু এখন সমুখে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও সে দেখতে পেল না। চলেছে। মাথার উপর সূর্য্যের কিরণ প্রখর হয়ে উঠলো; পিপাসায় তালু ওর শুকিয়ে উঠেছে—তবু চলেছে অমরনাথ। চলতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ বনে বিশ্রাম করতে ওর সাহস হচ্ছে না। সে জানে না, বাঘ ভাল্লুক কোন দিক থেকে তাড়া করবে কি না। কিন্তু যত যাচ্ছে, বন আরো গভীর হচ্ছে। খুবই ভয়ের কথা!

বেলা হয়তো দশ এগারোটা হবে। পকেটে যা-যৎসামান্য খাবার ছিল—সকালেই খেয়ে ফেলেছে; এখন অন্ততঃ এক গ্লাস জলের দরকার। এতবড় পাহাড়ে একটা ঝরণাও কি

থাকতে নেই? কত—কত দূরে যে সে হেঁটে এল, হয়তো দশ-বিশ কোশ! কিন্তু অমর জানে না যে পাহাড়ি পথ হাঁটার অভ্যাস না থাকায়, আর ঠিক পথে না চলায় তার এত দীর্ঘক্ষণ ধরে হাঁটায়ও বড় জোর চার-পাঁচ মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করা হয় নি!

ক্লান্ত অমর প্রায় নিরাশ হয়ে বসবার জন্য একটা বড় মত গাছ খুঁজছে,—হঠাৎ দেখতে পেল, একজন কাঠুরিয়া একটা শুকনো গাছের ডাল কাটছে। অমর এগিয়ে এসে ওকে জিজ্ঞাসা করলো,

—কাছাকাছি কোথাও নদী আছে হে? জল খেতে হবে!

—উধার যাও—বলে লোকটা ওকে উত্তর দিকে যেতে নির্দ্দেশ দিল!

—এখানে শহর-বাজার-গাঁ কোন্ দিকে পাওয়া যাবে?

—মালুম নেহি—বলে সে দুমাদুম কাঠ কাটতে লাগলো।

অমরও আর কিছু না শুধিয়ে চলে গেল উত্তর দিকেই। লোকটা হয়তো অমরের বাংলাকথা বুঝতে পারে নি। এটা তো বাংলাদেশ নয় আর বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষাও নয়—ও বুঝবে কি করে? কিন্তু বাংলাভাষাটা যদি ভারতের সব যায়গায় প্রচলিত হোত তো কী ভালই যে হোত। কেন হোল না? হওয়াই তো উচিৎ ছিল। ভারতবর্ষের আর কোনো ভাষাই তো বাংলাভাষার মত শক্তিশালী ভাষা নয়। তবু কেন বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হোল না—অমর দুঃখিত মনে

হাঁটছে। একটা ঝোপের এ পাশে আসতেই ওর নজরে পড়লো নদী ; বেশ বড় নদী—বর্ষার জল পেয়ে ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছে যেন। আর প্রখর স্রোত। উঃ! অমর চেয়ে চেয়ে দেখলো কিছুক্ষণ নদীটাকে। বাংলা দেশে নদীর অভাব নেই, কিন্তু এমন স্রোতোচ্ছলতা, এমন আবর্ত্ত, এমন শক্তিমত্তা ও এর আগে আর দেখেনি! চমৎকার দেখাচ্ছে। জল খেতে নামতে হবে, কিন্তু ওর ভয় করতে লাগলো, যদি পড়ে যায় তো ইহজন্মে আর ওঠা যাবে না। কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে তা কে জানে।

জল কিন্তু খেতেই হবে। একটু জিরিয়ে খাবে জল। অমর বসলো একটা গাছের ছায়ায়। অনেকটা দূরে নদী বাঁক ফিরেছে ; সেখানে আবর্ত্ত আরো ভীষণ—আরো উচ্ছল। দূর থেকে ভালো দেখা যাচ্ছে না, অমর যাবে নাকি ওখানেই? গেলেই হয়—ওখানে গিয়েই নাহয় জল খাবে।

উঠে অমর চলতে লাগলে! ওখানে দু-তিন জন লোক রয়েছে। মাছ ধরছে হয়তো ; কিন্তু মাছ তো ধরছে না। ওরা একটা প্রকাণ্ড হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে—লোহার হাতল।

অমরের গোয়েন্দা-মন সংশয়াকুল হয়ে উঠলো! ঐ বাঁকের পাহাড়ের গায়ে নিশ্চয় ফাটল আছে, যে পথে সেই আঁধার গুহাটায় জল ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঐ হাতলটা নিশ্চয় গুহামুখ খুলবার এবং বন্ধ করবার চাবি। ওটা লক্

গেট্—অমর আড়ালে আড়ালে যতটা সম্ভব এগিয়ে এসে একটা উঁচু মত টিলার পেছনে দাঁড়ালো।

জাগুয়ার!

সন্দেহটা নিশ্চিত হয়ে গেল অমরের কাছে। ঐ শয়তানরা এই পথেই গুহার ভেতর জল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এতক্ষণ হয়তো গুহার সবটা ডুবে গেছে। অতএব এবার জল ঢোকা বন্ধ করে দেবে—তারপর আবার দরকার হলে পাম্প করে গুহার জল বের করে গুহাটাকে ব্যবহার করবে—এই ওদের মতলব। প্রায় পাঁচশো হাত তফাতে অমর দাঁড়িয়ে। জাগুয়ার এবং আর তুজন লোক কাথাবার্ত্তা কইছে, কিন্তু নদীর হাওয়া খুব বেশী তাই অমর ওদের কোনো কথাই শুনতে পেল না। দেখতে লাগলো, ওরা লোহার সেই ডাণ্ডাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণ দিকে—যেদিকে গুহার সেই দরজা, যে দরজা দিয়ে অমর ঢুকেছিল, সেই দিকে চেয়ে রয়েছে। কোনো নিশানা হয়তো দেখান হবে ওখান থেকে।

অমরের অনুমান সত্য। সে দেখতে পেল, বহু দূরে একটা উঁচু পাহাড়ের উপর একটি উঁচু গাছ, তার মাথায় একটি নিশান উড়লো আর সেই নিশান দেখামাত্র জাগুয়ার আর তার সঙ্গীরা সকলে চাপ দিতে লাগলো সেই লোহার ডাণ্ডাটায়। মিনিট খানেকের মধ্যেই প্রকাণ্ড একটা পাথরের চ্যাঙড় সবেগে পড়লো নীচে—নদীর কিনারায়, যেখানে একটা সরু ফাটলে নদীর জল পাহাড়ের ভেতর সেঁধুচ্ছে বলে অমর

অনুমান করেছে। পাথরটা পড়ে জল ছিট্‌কে উঠলো এতো জোরে যে জাগুয়ার আর সঙ্গীরা প্রায় আধভেজা হয়ে গেল। ওরা হেসে উঠলো জলের ছিটে লাগায়। তার পর সঙ্গী দুজন চলে গেল একদিকে, কিন্তু সর্ব্বনাশ, জাগুয়ার যে অমরের এই টিলাটার দিকেই আসছে। অমর লুকোবার জন্য ঝোপের আড়ালে ঢুকলো—তার মহা সৌভাগ্য, জাগুয়ার তাকে দেখতে পেল না, টিলা পার হয়ে চলতে লাগলো বনের পথে।

অমরও ঝোপ থেকে বেরিয়ে ওর পিছু নিল—জল আর খাওয়া হোল না ওর। কারণ জল খেতে যা সময় লাগবে, তার মধ্যে জাগুয়ার বনের আড়ালে হারিয়ে যেতে পারে।

অমর ভেবেছিল, জাগুয়ারের পিছনে বহু দূর তাকে হাঁটতে হবে, কিন্তু এবার তার অনুমান সত্য হোল না। মাত্র আধ মাইল খানেক হেঁটেই জাগুয়ার বনের মধ্যে একটি আদি বাসীর পল্লীতে এসে পৌছালো। দশবার ঘর অধিবাসী মাত্র ওরা, ছোটছোট পাতার কুঁড়েতে বাস করে। জাগুয়ার ওরই একটা ঘরে ঢুকে পড়লো। অমর এখন করবে কি? সে কোথায় যাবে? ওদিকে বেলা বোধহয় বারটার উপর। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অমরও ঐ পল্লীতে ঢুকে একটি বুড়ি মেয়েকে বললো—একটু জল দিতে পার মা!

—আ যাও বাচ্চা!—বলে বুড়ি ওকে সাদরে ডেকে ঘরে নিয়ে গেল। ঠাণ্ডা ঘরে বসে অমরের যেন জীবন এল।

কিছুক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করে সে জল খেল, তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছে—জেগে দেখে অন্ধকার।

রাত হয়ে গেছে নাকি? না—এ তো রাতের অন্ধকার নয়—অমরের হাত পা শক্ত দড়িতে বাঁধা, আর তার টর্চ্চ রিভলভার, এমন কি গত রাত্রে পাওয়া সোনার আংটি সবই চুরি হয়ে গেছে। খুব ভাল হয়েছে! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। জাগুয়ার ওখানে রয়েছে, জেনেও অমর কেন ঐ শত্রুপুরীতে ঘুমুতে গেল? অমর আবার গোয়েন্দা হবে কখনো—ফুৎ!

নির্ব্বোধ—গর্দ্দভ!!! অমরের মত গর্দ্দভ ছেলে পৃথিবীতে কমই জন্মায়। অমর আর কখনো বেঁচে বাড়ী যাবে, নাকি এই অন্ধকার ঘরেই তিলে তিলে মরে যাবে, তাই এখন চিন্তার কথা। কিন্তু চিন্তা করেই বা হবে কি? অমর এখন ওদের কৃপার ভিখারী—কিন্তু সব চিন্তা ছাড়িয়ে অমরের খিদেটা বড় চাগিয়ে উঠলো; কোথায় খাবার?

কতক্ষণ ধরে কত কি ভাবছে অমরনাথ—হঠাৎ ঘর খুলে কে ঢুকলো—হাসছে। হাসির আওয়াজে মনে হয় মেয়ের গলা।

—বিবিকে এখনো চিনলে না অমর?—পরিষ্কার বাংলা কথায় বললো নবাগতা মেয়েটি। অমর গলার স্বরে বুঝলো, যার কাছে সে জল খাবার জন্য এসেছিল, এ সেই!

—জল খেতে এসে ছিলাম, তার ফল পাচ্ছি। অমর সখেদে বলল।

—এই বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দা হবে? বিবির সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও?

বিবির কথা ব্লাড্ ব্যাঙ্কার দেখবার সময় জেনেছে অমর। বিবি যে কতবড় শয়তানী তা ওর জানা, তবু সাহস করে বলল,

—যুদ্ধ তো করবই, দেখা যাক—কে জেতে কে হারে।

—হিঃ হিঃ হিঃ।—ব্যঙ্গ করলো বুড়ি—তোমাকে গোয়েন্দার ভূত করা হবে।

—তার মানে?—আমাকে এমন করে কতদিন রাখবে তোমরা?

—রাখবো কেন। তোমাকে মাস ছয়েক পরেই ছেড়ে দেওয়া হবে ভূত তৈরী করে; তুমি হবে গোয়েন্দা ভূত, কিম্বা ভূতো গোয়েন্দা।

—আমাকে খুন করে ভূত করে ফেলবে—বলচো? অমর শুধুলো।

—না-না, খুন কেন করবো! তোমার চোখদুটো উপড়ে ফেলা হবে—যাতে চিরকাল চোখে এমনি অন্ধকার দেখ!

—তারপর?—অমরের আতঙ্ক জাগছে খুবই, তবু শুধুলো, —তারপর?

—তোমার হাতের আঙুল সব কেটে ফেলা হবে—যাতে আর অটো-রিভলভারে কখনো হাত না দাও।

—হুঁ—আর কিছু ?

—সেই কাটা হাতের ঘা শুকোবার জন্য তোমাকে মাস ছয়েক আমাদের হাসপাতালে রাখা হবে—রবারের বল মুখে দিয়ে—যাতে কথা বলতে না পার।

—কেন ? কথা বলাটা বন্ধ করবে কিসের জন্য ? ওখানে কি কোনো পুলিশ আসতে পারে যাকে আমি তোমাদের শয়তানীর কথা বলে দেব, মনে করছো ?

—মোটেই না ; তোমাকে কথা বলতে দেওয়া হবে না—শুধু কথা শোনানো হবে ! অর্থাৎ ভূতেরা কি ভাবে গোয়েন্দার কাজ চালায়—তাই শেখানো হবে। মনে পড়ছে, তোমাকে একবার আমাদের বিবি গোয়েন্দার কাজ শেখাবার জন্য ডেকেছিলেন ? এবার সেটা শিখে নাও।

অমর চুপ করে রইল—কিন্তু ভয়ে ওর শরীরের রক্ত জল হয়ে আসছে। সেই বুড়ি বললো আবার—শিকদারের শিষ্য তুমি, তোমার অভ্যর্থনা তো করা উচিৎ, ওঠো, খাও কিছু ! ভূতোগোয়েন্দা হওয়ার পর তোমার আর কিছু না খেলেও চলবে। ভূতরা তো আর সত্যি কিছু খায় না !

সুইচ টিপে আলো জ্বালালো বুড়ি। আশ্চর্য্য ! এই পাহাড়ের ছোট পল্লীতে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে কেমন করে ? কিন্তু অমর বুঝতে পারলো, ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে নিশ্চয় কোনো শহরে বা কারখানায় আনা হয়েছে ; সেখানে বিজলী বাতি জ্বলে ! কারখানার মত শব্দও শুনতে পাচ্ছিল

অমর। বুড়ি সত্যি খেতে দিল ওকে, ভাত, ভাজা, মাংসের ঝোল। সুন্দর গন্ধ ছাড়ছে মাংসের। অমরের জিভ লালা-সিক্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু হাত-পা বাঁধা, খাবে কি করে? বললো—

—বাঁধন খুলে দাও, না হলে খাবো কি করে?

—না; বিবির হুকুম নেই? এসো, আমি খাইয়ে দিই!

হাসছে বুড়িটা। অমর কি কোলের ছেলে নাকি যে তাকে ও খাইয়ে দেবে! রেগে বললো—থাক্—অত দয়ার দরকার নেই! বাঁধন না খুলতে চাও, তো খেতে দিতে আস কেন? চোখ উপ্‌ড়ে দেবে, হাত কেটে দেবে, এর পর আবার খাবার দেবার কি দরকার? যাও—চলে যাও!

—আমি তোমার বাবার জমিদারীতে নেই অমর—বুঝলে! এখানে আমিই কর্ত্রী! আমার যা ইচ্ছে করবো। ভালয় ভালয় খেয়ে নাও—নইলে ইলেকট্রিক শক্ লাগিয়ে বুঝিয়ে দেব, কী ভয়ঙ্কর লোকের পাল্লায় তুমি পড়েছ! এটা বিবির বন্দীশালা।

—বিবির বন্দীশালা!—অমর আগেই যথেষ্ট ভয় পেয়েছিল, শুধু মুখে সাহস দেখাচ্ছিল; এবার তার সব সাহস যেন হারিয়ে গেল। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললো,

—তাহলে আমিও বন্দী!

—সে তো তোমার হাতে-পায়েই প্রমাণিত হচ্ছে।

হাসলো বুড়ি আবার হিঃ হিঃ হি!!! রাগে দুঃখে আর

দুশ্চিন্তায় অমর কিছুই যেন ভাবতে পারছে না। বুড়ি ভাতে ঝোল মাখিয়ে ওর মুখে গ্রাস তুলে দিল। নিরুপায় অমর খাচ্ছে। আর, খিদেও বেজায় পেয়েছিল, কোনো কথা না বলে সে ভাত খেয়ে নিল—বেশ উদর পূর্ণ করেই খেল—এবং ঘরখানার চতুর্দ্দিক ভাল করে দেখেও নিল ঐ অবসরে। ওকে খাইয়ে দিয়ে বুড়ি আলো বন্ধ করে দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল, যাবার সময় বলে গেল—কাল সকালে আবার দেখা হবে—এখন ঘুমাও।

কিন্তু ঘুমিয়েছে যথেষ্ট অমরনাথ; ঘুমুবার আর ওর ইচ্ছে নেই। এখন তাহলে কি করা যায়? নিদারুণ অন্ধকার ঘরটায়। এখন রাত কত কে জানে। বাইরে থেকে যে কারখানার কলচলার মত আওয়াজ আসছিল, তাও আর আসছে না—তাহলে রাত কি খুব বেশী হয়েছে? যতই রাত হোক, অমরের কি? তাকে তো এখানে থাকতেই হবে। কিন্তু কেন থাকতে হবে? অমর নিশ্চয়ই নিজেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। ঐ আলোর সুইচটা কোনখানে আছে, দেখে নিয়েছে অমর। কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই পারছে না সোজা হয়ে—হাতের সঙ্গে পা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা; খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কাজেই সুইচটা টানবার কোনো উপায়ই করতে পারলো না! দড়িটা রেশমের দড়ি—নিদারুণ শক্ত, আর তার গাঁঠ রয়েছে অমরের পিঠের উপর, কাজেই দাঁত দিয়ে সে গাঁঠ খোলা সম্ভব নয়। তবে উপায় কি?

হীরের আংটিটা লালবাবুরই ছিল—ওরা নিয়েছে, যাকগে, কিন্তু অমরের রিভলভার, টর্চ্চ এবং আর যাকিছু ছিল, সবই তো ওরা কেড়ে নিয়েছে। ছুরি ছিল একখানা, সেটা যদি কাছে থাকতো। আঃ, তাহলে অমরকে এতক্ষণ পায় কে! কিন্তু অমরের থেকে ওরা অনেক বেশী বুদ্ধিমান—তাই ছুরি —টর্চ্চ,—পিস্তল আগেই কেড়ে নিয়ে অমরকে এখানে বন্দী করেছে। আচ্ছা, দেখা যাক!

অমর একবার তার শিক্ষাগুরু অরবিন্দ শিকদারকে স্মরণ করলো—ভারতের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা অরবিন্দ শিকদার—অমর তার শিষ্য! এত সহজে হার স্বীকার করবে অমর! না—অমর উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কিন্তু কিছুই করবার ক্ষমতা নেই ওর—হাত-পা বাঁধা! অথচ কিছু একটা করতেই হবে। মরতেই তো বসেছে অমর, দেখা যাক না—কি হয়! অমর গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার কাছে এসে বাঁধা পা দিয়েই ধাক্কা মারতে লাগলো আর গোঁ গোঁ করে চেঁচাতে লাগলো। মানুষ অজ্ঞান হয়ে গেলে যে-রকম করে চেঁচায়, ঠিক তেমনি ভাবে চেঁচাতে লাগলো—গোঁ—গোঁগোঁ—গোঁ-গোঁ-গোঁ।

ভূতো গোয়েন্দা অমর যেন ভূত হয়েই চেঁচাচ্ছে। মিনিট চার পাঁচ কাটলো—সজোর লাথি মারছে অমর দরজায়—তার সঙ্গে গোঁ—ওঁ—ওঁ···!—চীৎকার!

দরজা খুলে সেই বুড়িই ঢুকলো—আলোটা জ্বেলে শুধুলো, —হোল কি অমর—কি হোল? অ্যাঁ—অমর—অমর!

অমর যতদূর সম্ভব জোরে হাত-পা ছুড়তে লাগলো আর গোঁ—ওঁ—ওঁ—ওঁ—চেঁচাতে লাগলো। বুড়ি দুমিনিট দেখলো অমরকে! অমরের চোখ ওপর দিকে উঠে গেছে—মৃগী রোগীর মত মুখের চেহারা। বুড়ি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে একটা সিট্‌কেপানা লোককে ডেকে আনলো—দেখোতো মৃগীরোগ নাকি?

—কি হে ছোকরা? হোল কি?

বলে লোকটা অমরের চোখের পাতা খুলে দেখছে, হ্যাঁ, মৃগী রোগ নিশ্চয়ই; কিম্বা খাদ্যের সঙ্গে কোনো রকম বিষ যায়নি তো ওর পেটে? লোকটা সেই বুড়িকে শুধুলো, —কতক্ষণ আগে খেতে দিয়েছো?

—এই তো আধঘণ্টা হবে!

—চলো, বাইরের হাওয়াতে নিয়ে যাই—তারপর বাঁধন খুলে দিতে হবে।

—বাঁধন খুলতে নিষেধ আছে! চলো—বাইরে নিয়ে যাই ওকে!

দুজনে ধরাধরি করে অমরকে বাইরে আনলো। অমর এর মধ্যে টুক্ করে একবার চোখ মেলে দেখে নিয়েচে, সিট্‌কে লোকটা সেই ডাক্তার।

—তুমি ওকে কোনোরকম ভয় দেখিয়েছিলে নাকি? ডাক্তার বলল।

—হ্যাঁ, বিবির আদেশমত বলেছিলাম যে ওকে অন্ধ করে দেওয়া হবে—হাতের আঙুল কেটে দেওয়া হবে—

—তার ভয়েই হয়তো মূর্চ্ছা গেছে কিম্বা কোনোরকম বিষ ওর কাছে ছিল, তোমাদের হাতে ও ভাবে যন্ত্রনা সহ্য করার চাইতে সেই বিষই খেয়ে দিয়েছে !

—ও বিষ কোথায় পাবে ?—বুড়ি আশ্চর্য্য হয়ে বললো !

—ও সাংঘাতিক শয়তান। আমারই গলা টিপে সেদিন ওষুধ আর শিক্‌দারের মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল। মরুক হারামজাদা—ওকে একফোঁটা জলও দিও না !

—কিন্তু বিবির আদেশ আছে, ওকে যেন ভালভাবে রাখা হয়—ভাল খাবার দেওয়া হয় !

—তাহলে হাত-পা খুলে দাও। ওষুধ নিয়ে আসি আমি।

ডাক্তার চলে গেল। বুড়ি সত্যিই খুলে দিল অমরের বাঁধন। অমর একবার চোখ চেয়ে দেখে নিল চারদিক—বেশ খোলা একটা মাঠের মত যায়গায় তাকে রাখা হয়েছে। এটা কারখানার উঠোন হয়তো। ডাক্তার ফিরে আসবার আগেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে ! অমর সবেগে উঠে বুড়িকে সজোরে লাথি মেরে দূরে ফেলে দিল—তারপর দে-ছুট একদিকে। বুড়ি ওদিকে চেঁচিয়ে উঠছে—হারামজাদা !···

উদ্দাম বেগে ছুটে পালিয়ে গেল অমরনাথ অন্ধকারের মধ্যে। কোন্‌দিকে যাচ্ছে ঠিক নাই—কোনোরকমে পালিয়ে

যেতে পারলেই যেন বাঁচে, কিন্তু অমরনাথের দুরদৃষ্ট—সামনে প্রকাণ্ড উঁচূ পাঁচিল। ভাগ্যিস্ সাদা রঙের দেওয়ালটা অন্ধকারেও দেখতে পেয়েছিল অমর, নইলে হয়তো এসে এমন জোর ধাক্কা খেতো যে মাথাটা ওর গুঁড়ো হয়ে যেত। অমর হতাশের মত থেমে গেল।

মস্ত উঁচু পাঁচিল—প্রায় দুই মানুষ উঁচু। লাফিয়ে বা অন্য কোনোরকমে পার হয়ে যাওয়া একান্তই অসম্ভব। ওদিকে সেই ডাক্তার নিশ্চয় এর মধ্যে ফিরে এসেছে এবং ওরা সকলে মিলে অমরের খোঁজ করছে। অতএব মিনিট কয়েকের মধ্যেই আবার অমরকে ধরা পড়তে হবে।—আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই দেখতে পেলনা অমর।

পিছনে চেয়ে দেখলো, আট-দশটা টর্চ্চ হাতে কারা যেন চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—নিশ্চয় অমরকেই খুঁজছে। মরিয়া হয়ে অমর দেওয়ালের কোলে-কোলে ছুটতে লাগলো উত্তর দিকে। অনেক খানা ছুটে এল—দেওয়ালের যেন শেষ নাই। কত বড় যায়গা এটা? উঃ! অমর হাঁফিয়ে উঠেছে, কিন্তু ওরাও আসছে—অমরকে ওরা নিশ্চয় খুঁজে বের করবে—তারপর আবার সেই আগেকার ঘরে বন্দী করবে। অমর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—এমনকি, ওর পায়ের জুতো-জোড়া পর্য্যন্ত খুলে নেওয়া হয়েছে—শুধু প্যাণ্ট, কোট্ আর সার্টখানা আছে পরনে। এ অবস্থায় ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া নিতান্তই মুর্খতা। যেভাবে ওরা টর্চ্চের ফোকাস করছে, তাতে অমরকে দেখতে

পেতেও আর দেরী নাই। দাঁড়িয়ে থাকলে আরো শিগ্রী দেখতে পাবে। এদিকটায় বেশ বড় বড় ঘাস; অমর শুয়ে পড়লো ঘাসের উপর। ওর খাঁকি পোষাক ঘাসের রংএর সঙ্গে বেশ মিলে গেছে। যদি দেখতে না পায় অমরকে তাহলে বেরুবার ব্যবস্থা পরে করা যাবে—এই ভেবেই অমর চুপছাপ শুয়ে রইলো।

ওর পিঠের উপর দিয়ে টর্চের ফোকাস যেতে লাগলো; লোকগুলো টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজতে লাগলো ওকে—কিন্তু অমর তো এখন আর ছুটছেনা, দাঁড়িয়েও নেই। ঘাসের রঙের সঙ্গে ওর পোষাকেরও রঙ মিলে যাওয়ায় দূর থেকে ওরা অমরের দেহটাকে ঘাসই মনে করছে। ওরা অমরকে খুঁজবার জন্য অন্য দিকে চলে গেল—হয়ত এযাত্রা বেঁচে গেল অমর।

কিন্তু বেঁচে অত সহজে যাবার উপায় কি! অমর শুনতে পেল, কে যেন বলছে—কুকুরদুটোকে খুলে দাও; কামড়ে ছিঁড়ে দিক ব্যাটাকে।—ডাক্তারের কণ্ঠস্বর। কথাটা শুনেই অমরের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগলো। এবার শিকারী কুকুর ছেড়ে দিয়ে তাকে খোঁজা হবে—আর এদের কুকুরের হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নিশ্চয়ই নেই। অমর কি আত্মসমর্পন করবার জন্য হেঁকে বলবে যে সে এখানে রয়েছে! না—যা হয় হোক, অমর আর একবার বাঁচবার চেষ্টা করবে। অমর উঠে বসলো উপায় চিন্তা করতে।

ওদেরই টর্চের আলোতে অমর দেখেছিল, রশিখানেক

দূরেই একটা গোলছাদ-ওয়ালা গুম্‌টি ঘর। ও ঘরটায় কি আছে, জানে না অমর, কিন্তু ঐটাই বর্ত্তমানে নিরাপদ স্থান ভেবে সে গুড়িমেরেই চলে এল ওখানে।

ঘরের দরজায় ডবল তালা; দরজা জোড়াটাও অত্যন্ত শক্ত। ওদিকে নিশ্চয় এতক্ষণে কুকুর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘরটার ভিতরে ঢুকবার কোনো উপায়ই নাই। কাছাকাছি অন্য কোনো ঘরও দেখতে পাওয়া গেল না। অমর আর কোনো উপায় না পেয়ে নীচু মতন সেই গুম্‌টি ঘরটার গোল ছাদে উঠে পড়লো। কুকুরগুলোর এখানে উঠে তাকে ধরতে অন্তত কিছুক্ষণ দেরী হবে—এই আশা।

ছাদটি অর্দ্ধবৃত্তাকার কংক্রিটের তৈরী। বিশেষ রকম মজবুত। ওর উপরে হাওয়া ঢুকবার জন্য দুটো বড় বড় চিনে মাটির পাইপ্ রয়েছে; বাঁকানো পাইপ্—কুলি ধাওড়ায় যে-রকম নল থাকে ভেন্টিলেশনের জন্য। দুটো নলই বেশ মোটা—প্রায় একফুট হবে তার ভেতরের ছ্যাঁদাটা। ঘরটার ভেতর ভালোভাবে হাওয়া যাবার জন্যই ঐ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অমর ঐ নলের একটাকে ধরে তার আড়ালে বসে দেখতে লাগলো। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকার জন্য ওর চোখে আঁধার সয়ে গিয়েছিল, তাই দেখতে পেলো আবছামত—বহু দূরে দুজন মানুষ এই দিকেই আসছে। অমরকেই খুঁজতে আসছে নিশ্চয়। ওদের হাতে কিন্তু আলো নাই। কে ওরা?

অমর নিঃশব্দে বসে দেখতে লাগলো। এই ঘরটার দিকেই

আসছে ওরা। ধরতে আসছে অমরকে। ধরবে, ধরুক; বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই অমরের। নিরাশ হয়েও অমর নিশ্চুপে বসে রইল সেই বঁড়শীর মত নলটার আড়ালে। লোকদুটি সটান চলে এলো গুম্‌টি ঘরটার দরজার কাছেই। চাবি দিয়ে দুটো তালাই খুললো, তারপর দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললো। ভেতরে ঢুকেই ওরা সুইচ্‌ টেনে আলো জ্বালালো—সেই আলোর কিছুটা অংশ বাইরের ঘাসের উপর পড়ছে এসে। অমর কাণ পাতলো নলের মুখে—ঘরের মধ্যে ওরা কি কথা কয়, শুনবার জন্য। একটু পরেই শুনতে পেল—তুমি গিয়ে 'বিবি'কে বল যে রাজাবাহাদুর তিনলাখের বেশী দিতে চাইছেন না, বড় জোর আর লাখখানেক উঠতে পারেন। এখন কি করা হবে!

—বেশ! আর ঐ শূয়ারটার কথাও বলবো নাকি?

—কার কথা? অমরের? না—ও আর যাবে কোথায়? কুকুর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এক্ষুনি ধরা পড়বে। এখান থেকে ভূতেরও পালাবার সাধ্য নেই। ওতো মানুষের বাচ্চা।

—শয়তানের বাচ্চা! ওকে কিন্তু ধরা চাই-ই! হারামজাদা আমাকে দু-দুবার ঠকিয়েছে।

—তাই তোমার রাগ ওর উপর? কিন্তু, ডাক্তার, ও নিতান্ত ছেলেমানুষ! ওর উপর রাগ করলে তোমার নিজের মর্য্যাদাই ক্ষুণ্ণ হয়। যাক্‌, তুমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি এখানেই অপেক্ষা করতে লাগলাম; কেমন?

—হ্যাঁ, আমি কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

'ক্যাঁচ-ক্যাঁচ' করে কেমন একটা শব্দ হোল। অমর আর কিছু শুনতে পেল না। কিন্তু দেখতে পেল, দুটো কুকুর শন্ শন্ করে ছুটে আসছে এই দিকেই। ঘেউ ঘেউ করে ওরা দুবার চীৎকার করলো। অমরকে দেখতে পেয়েছে নাকি শয়তান দুটো? সর্ব্বনাশ!

ভেতর থেকে জাগুয়ার বেরিয়ে এসে বললো—শেটান, ঘোষ্ট্ থাম্ আমি রয়েছি এখানে—চুক্ চুক্ চুক্!

কুকুর দুটো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ওর কাছে এল। জাগুয়ার ঘরের দরজা বন্ধ না করেই ওদের নিয়ে ত্রিশ চল্লিশ হাত চলে গেল, বললো,—উধার যা, উধার। খুঁজে বার কর হারামজাদাকে!

কুকুরদুটো আর একবার চীৎকার করলো ঘেউ-ঘেউ! জাগুয়ার আবার ধমক দিয়ে বললো—গো—যাও, ওদিকে যাও!

এই অবসর! মহাসুযোগ! ডাক্তারের সঙ্গে জাগুয়ারের কথা শুনেই অমর বুঝে গিয়েছে যে এই ঘরটির ভেতর দিয়ে কোনো গুপ্ত পথ আছে, যে পথে 'বিবি' নামক জনৈক ব্যক্তির কাছে যাওয়া যায়। অতএব ঘরটার ছাদ থেকে অমর টুপ করে নেমে পড়লো—দেখলো, জাগুয়ার কুকুরদুটুকে ধম্‌কাচ্ছে। অমর সুট্ করে ঘরটার ভেতর ঢুকে পড়লো।

আলোটা জ্বলছে। মেঝের এক কোণে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একটু যায়গা ফাঁক হয়ে রয়েছে, তার নীচে দিয়ে সিঁড়ি—অমর খালি

পায়ে আছে—কিছুই শব্দ হোল না, সুট্ করে নেমে পড়লো সিড়িতে! আর এক মিনিট দেরী হলেই জাগুয়ার তাকে দেখতে পেত, অমর বুঝতে পারলো, জাগুয়ার ঘরের মেঝেতে ফিরে এসেছে, কিন্তু সে তখন সিড়িতে ; গড়গড় করে নাম তে লাগলো অমর সিড়ি দিয়ে ।

আলো জ্বলছে বরাবর—ডাক্তার নীচের আলোগুলো জ্বেলে রেখে গেছে ; অমরের সুবিধাই হোল। খুব দ্রুতই চলতে লাগলো। সুদীর্ঘ সিড়ি ; কত নীচে নামছে অমর কে জানে—নামছেই !

অবশেষে সিড়ির শেষ হোল—বেশ একটা হল্মত ঘরে এলো অমর। চারদিকে আসন-কুশন্ পাতা, যেন বড়লোকের বৈঠকখানা। আলো জ্বলছে, সিলিংএ ফ্যান ঝুলছে—কয়েকটা মার্ব্বেল ষ্ট্যাচুও রয়েছে। ঘরখানা নিশ্চয়ই মাটির নীচে, কিন্তু চোক বন্ধ করে কোনো লোককে যদি এই ঘরে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে কোনো রকমেই বুঝতে পারবে না যে এটা মাটির নীচের ঘর। অমর ওদিকের দরজা দিয়ে এগিয়ে চললো। নানা রকম অ্যাসিড, ইত্যাদির গন্ধ আসছে। এখানটায় কোনো ল্যাবরেটরী আছে নাকি! যাই থাক, অমরের এখন আত্মগোপন করে এই যমপুরী থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। তার আগে যতটা পারে তথ্য অবশ্য সংগ্রহ করে যাবে অমর।

একটা লোক আসছে এই দিকে। অমরকে দেখতে পাবে

এখুনি, অমর চট্ করে পাশের একটা ঘরে ঢুকে দরজার আড়ালে দাঁড়ালো। লোকটা চলে গেল অমরকে ছাড়িয়ে। কিন্তু অমর বুঝতে পারলো, এখানে বিবি ছাড়াও আরো লোক আছে। তাকে খুব সাবধানে যেতে হবে। বাঘের ঘরে সে ঢুকেছে, এখন বেরুতে পারলে হয়।

অমর আবার বেরিয়ে হাঁটতে লাগলো চারদিকে নজর রেখে। বাঁ দিকে মোড় ফিরে দেখে, একটা দরজায় ভারি পর্দ্দা ঝুলছে—ভেতরে লোক রয়েছে। অমর নিঃশব্দে দাঁড়ালো পর্দ্দার এপাশে। একটি মহিলা অনেকগুলো কাগজপত্র নিয়ে কি যেন দেখছেন কিম্বা খুঁজছেন, মনে হয়। ও-ঘরে আর কেউ নেই। কয়েক মিনিট্ খুঁজে মহিলাটি ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বেছে নিলেন—কাগজটা খুবই পুরোনো—হাতে লেখা কোনো পুঁথীর পাতা। এতো প্রাচীন পুঁথীর পাতায় কি বিষয় লেখা আছে, জানতে অমরের অত্যন্ত আগ্রহ হোল—কিন্তু মহিলাটি সেই পাতাটি অতি যত্নে বুকের ব্লাউজের তলায় রেখে ঘরের একটা আলমারী খুলে বাকি কাগজগুলো রেখেদিলেন। এবার হয়তো তিনি বাইরে বেরুবেন এবং অমরকে দেখতে পাবেন। অমর ধাঁ করে জল-রাখা একটা বড় টবের পাশে দাঁড়ালো। মহিলাটি যেন অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছেন—যেন উনিও ভয় করছেন ওঁকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। তিনিও যেন কাগজ টুকরোটি চুরি করছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে উনি দ্রুত চলে গেলেন অমর

যেদিক থেকে এসেছে, সেইদিকে। অমরও টবের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওঁর পিছু নিল। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে—মহিলাটি পিছনে চাইলেই অমরকে দেখতে পাবেন, কিন্তু উনি কোনেদিকে চাইলেন না—সটান চলতে লাগলেন সোজা! অমর সেদিকে যায়নি—সে বাঁ দিকে বাঁক ফিরেছিল, মহিলাটি সোজাই হাঁটতে লাগলেন। এদিকে কোনো আলো জ্বলছে না, ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আরো খানিক এগিয়ে এসে মেয়েটি ডানদিকে বাঁক ফিরছেন। অমরও অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ওঁর খুব কাছাকাছিই চলতে লাগলো! মিনিটখানেক হাঁটছে দুজনেই; —একটা ঘরের দরজার কাছে এসে পৌঁছালেন মেয়েটি। দরজা বন্ধ—তিনি টোকা মারলেন। ভেতর থেকে কে শুধুলো,—কে?

—নয় নম্বর!—উত্তর দিলেন মেয়েটি!

দরজার খুলে গেল। ভেতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। আধমিনিটের মধ্যে দরজাটা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল; মেয়েটি ভেতরে ঢুকলেন। অমর ঢুকতে পারলো না; অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইল। এখন কি করা তার কর্ত্তব্য? পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে ভাবছে অমর—হঠাৎ দরজা খুলে বেরুলেন সেই মেয়েটি আর ডাক্তার। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারে ডাক্তার বা মহিলাটি অমরকে দেখতে পাচ্ছেন না। অমর নিঃশব্দে ওদের অনুগমন করতে লাগলো। দুমিনিট ওরা এগিয়ে এলো

এই দিকে, ডাক্তার বললো,—কৈ, পাতাখানা দাও! আজ তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি!

—লাখের কম আমি একাজ করতে পারবো না—আর টাকাটা নগদ চাই।

—নগদ কোথায় পাব অত টাকা! বেয়ারার চেক্ দিচ্ছি! দাও—লাখ টাকা নয়, আজ পঞ্চাশ হাজারই নাও, পরশু বাকিটা সবই দিয়ে দেব।

—না—মেয়েটি বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই বললেন—অত কমে এসব কাজ হয় না। ধরা পড়লে আমার হাড়-মাংস কোথায় যাবে, জানা আছে তো! টাকার লোভেই করছি আমি এই কাজ—সবশুদ্ধ দেড় লক্ষ টাকা চাই আমার।

—অত বেশী দিতে পারবো না। তোমার যে দেখছি দাবী বেড়েই যাচ্ছে!

—দাবী খুবই কম। ভেবে দেখ ডাক্তার, কিরকম বিশ্বাস-ঘাতকতা করছি আমরা—আমি এবং তুমিও। রাজাবাহাদুরের মেয়েটার জন্য যে টাকা তোমরা পাবে, তার সিকি অন্তত আমাকে দাও—কারণ আমিই ওর সন্ধান দিয়েছি, আমিই ওকে আনবার সুযোগ করে দিয়েছি—আমি না থাকলে তোমরা কখনো একাজ করতে পারতে না!

—তা সত্যি, কিন্তু পাচ্ছি তো মোট পাঁচ লক্ষ।

—তার সিকি অন্ততঃ সওয়া লক্ষ আমাকে দিতে হবে। নইলে আমি আর এগুবো না।

—কিন্তু তিন লক্ষ দিতে হবে বিবিকে, বাকি দুলক্ষের সিকি হয় মাত্র পঞ্চাশ হাজার—দাও, আর দেরী করা চলে না, পাতাখানা দাও।

—না—লক্ষটাকার কমে আমি কিছুতেই দেব না।

—দেবে না কি! দিতেই হবে—দাও—বলেই ডাক্তার কেড়ে নিতে গেল ওর কাছ থেকে কাগজটা। কিন্তু কাগজখানা মেয়েটি কোথায় রেখেছেন, ডাক্তারের জানা নেই। মেয়েটি হাত তুলে হেসে উঠলেন,—সঙ্গে রাখবো, অত বোকা আমি নই।

ডাক্তার থেমে গেল, বললো,—দাও লক্ষীটি, দেরী করো না আর। এই নাও চেক্; বেয়ারার চেক্। ব্যাঙ্কে গেলেই নগদ টাকা পেয়ে যাবে।

চেকখানা ওর হাতে গুঁজে দিতে গেল ডাক্তার, কিন্তু মেয়েটি চেক না নিয়ে বললে—টাকা আমার নগদ চাই-ই, না দাও তো থাক্।

ও চলে গেল সটান সেই প্রথম দেখা ঘরটার দিকে। ডাক্তার মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে চলতে লাগলো। অমর বুঝতে পারলো, ডাক্তার সেই গুম্‌টিঘরের সিঁড়ির পথ ধরলো। কিন্তু অমর জানে, ওখানে জাগুয়ার এবং কুকুর আছে—সে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, কি করবে।

দাঁড়িয়ে থেকে ভেবে কোনো লাভ নেই; তার চেয়ে সেই মেয়েটি কোথায় গেল, এবং এখন কি করছে, সন্ধান নিলে অমরের কাজে লাগতে পারে। ডাক্তারের সঙ্গে মেয়েটির কথাবার্ত্তা শুনেই অমর বুঝতে পেরেছে,—বিবিকে লুকিয়ে এরা বিশেষ একটা গুরুতর কিছু চক্রান্ত করবার চেষ্টায় আছে, ঐ পুঁথীর পাতাটি সেই চক্রান্তের বিশেষ একটি অংশ। কিন্তু কি আছে ঐ পাতাটায়? লালবাবুর লাস খুঁজতে এসে অমর আর এক রহস্যে পড়ে গেল যে! কিনারা একটা করতে হবে।

অমর চলে এলো আগের দেখা পর্দ্দা টানানো ঘরের দরজায়। ভেতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু কেউ নেই। ঘরের মধ্যে ঢুকবে কি না, অমর ভাবছে,—মেয়েটি নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও আছেন, অমরকে দেখতে পেলে আর রক্ষা রাখবেন না, হয়তো খুনই করে বসবেন। অমর ঘরে না ঢুকে সেই জলের টবের আড়ালেই দাঁড়ালো।

শুনতে পাচ্ছে, গুম্‌টি ঘরের সিঁড়ির ওদিক থেকে পায়ের শব্দ—বেশ গম্ভীর দ্রুত পায়ের শব্দ। অমর পদশব্দ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। পদশব্দ শুনেই সে বলে দিতে পারে কজন আসছে বা যাচ্ছে। এখানের শব্দটা দুজনের—ঠিক দুজনেরই। টবের আড়ালে ভালো করেই লুকোলো অমর!

মেয়েটি পাশের ঘর থেকে খুব দ্রুত বেরিয়ে এলেন। তখনো

যুগল পদশব্দের অধিকারীরা এতখানা এসে পৌছান নি—কিন্তু তাঁদের চেহারা দেখা যাচ্ছে—জাগুয়ার আর ডাক্তার।

মেয়েটি ঝাঁ করে আলোর সুইচটা টেনে আলো নিবিয়ে দিলেন—তারপর স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ঐখানেই। কিন্তু অমর টবের আড়ালে—খুবই কাছে রয়েছে, সে বেশ বুঝতে পারছে, —বুকের ব্লাউজের তলা থেকে পুঁথীর পাতাটি বের করে মেয়েটি সেটা ঐ টবেরই তলায় ফেলে দিলেন, তারপর বাঁ পা দিয়ে গুঁজে দিলেন টব-বসানো ফাঁকের ভেতর দিকে। টবটা তিনখানা ইটের উপর বসানো রয়েছে।

ইতিমধ্যে জাগুয়ার আর ডাক্তার এসে বললো,

—কৈ—দাও পাতাখানা ; এই নাও চেক !

—চেক আমি নেব না—নগদ টাকা চাই !

—দেখ ন'নম্বর, বেশী শয়তানী করো তো তোমাকে এই-খানেই মেরে ফেলে দিতে আমার কিছুমাত্র দেরী হবে না। দাও, বের করে !—জাগুয়ার যেন হুঙ্কার দিল।

—দেব না,—মেয়েটিও যেন ভীষণ রেগে জবাব দিলেন—কি করতে পার করতো তোমরা। টাকার লোভেই এতবড় অন্যায় কাজ আমি করছি ; টাকাই যদি না পাই তো কেন করতে যাব ? আমাকে মেরে ফ্যালা অত সোজা হবে না। বিবির কাছে কৈফিয়ৎ দেবে কি ?

—টাকা তো দিচ্ছি তোমাকে। নগদ টাকা কোথায় পাব এত রাত্রে ?

—বেশ, কাল সকালে নগদ টাকা এনে পুঁথীর পাতাটা নিও।

—দেখ ন' নম্বর,—আমরা ঐ পুঁথীর পাতাটা চিনি না বলেই তোমার সাহায্য চেয়েছি,—আর তার জন্যই তোমাকে এখানে ঢুকবার সুবিধে করে দিয়েছি। এখন তুমি যদি ভালয় ভালয় আমাদের কথা শোনো, লক্ষ্মী মেয়ের মতন ওটা দিয়ে ফেল তো সবই ভাল হয়—নইলে তোমাকে নিয়েই একটা খুনখারাপী হয়ে যাবে···

জাগুয়ার বেশ ধীরে সুস্থেই বললো কথাগুলো, কিন্তু ন' নম্বর—নামে মেয়েটি আরো ধীরে সুস্থে বললেন যে তিনি দেবেন না, জাগুয়ারের যা করবার থাকে করতে পারে—অতি অল্প কথায় ঐটুকু বলেই মেয়েটি পাশকেটে যেই বিবির ঘরের দিকে যেতে চাইছেন—হয়তো পালাতে চাইছেন—অমনি জাগুয়ার এবং ডাক্তার দুজনেই পথ আগলে বললো—

—খবরদার! এক পা এগিয়েছ কি খুন করবো!

—তার মানে?

—মানে খুবই সোজা! পুঁথীর পাতাখানা দিয়ে ফেল, তারপর যেখানে ইচ্ছে যাও! বল তো আমরাই তোমাকে জাহান্নম পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।

হাসলো জাগুয়ারটা—সে কি বিকট হাসি! প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো যায়গাটা। সে হাসি শুনে অমরেরও ভয় করতে লাগলো। কিন্তু মেয়েটি কিছুমাত্র ভয় না করে সোজা জবাব দিলেন—এসো তাহলে!

—কোথায় ?

—কেন! জাহান্নমে!—বলেই উনি এগিয়ে যাচ্ছেন। অমর অবাক হয়ে গেল একটা মেয়ের অত বেশী সাহস দেখে। কিন্তু জাগুয়ার লাফ দিয়ে ধরলো ওর ডান হাতখানা—মোচড় দিয়ে বললো,—যাবি কোথায় শয়তানী? আগে পুঁথীর পাতাখানা দে—তারপর যাবি!

—গিলে ফেলেছি—হিঃ হিঃ হিঃ—খেয়ে ফেলেছি পাতাটা; হিঃ হিঃ হিঃ !!!

মেয়েটি হাসছে। জাগুয়ার নিদারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওর গালে ঠাস করে চড় কষে দিল একটা, বললো—ফের শয়তানী করছিস হারামজাদী! বের কর পাতাখানা—নইলে···

অমর ভাল দেখতে পাচ্ছে না, অন্ধকার! কিন্তু বুঝতে পারছে ডাক্তার এবং জাগুয়ার ছুটছে মেয়েটির পিছনে—মেয়েটি সেই বিবি যে ঘরে আছে, সেই দিকে যাচ্ছেন! অনেকটা দূরে গিয়ে জাগুয়ার আবার হয়তো ধরলো ওকে—কারণ অমর শুনতে পেল, জাগুয়ার বলছে,—

—বিবি তোর বাবা হয় হারামজাদী! বের কর—কোথায় রেখেছিস পাতাটা ?

—দেবো—না! মেয়েটি বললো!

ওখানে হয়তো একটা খণ্ডযুদ্ধ চলছে ওদের। অমর ইতিমধ্যে টবের আড়াল থেকে বেরিয়ে সেই টবেরই তলায় পড়ে-থাকা পুঁথীর পাতাখানি নিয়ে পকেটে গুঁজলো। এখন

পালাতে হবে। অমর পা-টিপে দ্রুত এগুতে লাগলো—উপরে উঠবার সিঁড়ির দিকে। কিন্তু সিঁড়ির উপর—সেই গুমটী ঘর, তারপর উঁচু দেওয়াল আর কুকুর খোলা আছে। ওপথে তো বেরুনো যাবে না! অমর ভাবতে ভাবতেই অনেকটা এগিয়ে এসে দেখতে পেল—একটা খণ্ডযুদ্ধই চলছে এখানে! মেয়েটি অসীম বলশালিনী নিশ্চয়। হয়তো, তিনি মেয়েই নন—ছদ্ম-বেশী পুরুষ! জাগুয়ার এবং ডাক্তার দুজনে মিলে এখনো ওঁকে কায়দা করতে পারে নি। অমর কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো—তিনজনেই ভীষণভাবে যুদ্ধে রত। তবে ডাক্তার প্রায় জখম হয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে—মাঝে মাঝে জাগুয়ারকে সাহায্য করছে!

অন্ধকারে অমরের চোখ কিছুটা অভ্যস্থ হয়ে এসেছে, তাই ডাক্তার আবার যেই জাগুয়ারকে সাহায্য করতে গেল, অমনি সে টুপ্‌ করে সেই স্থানটুকু পার হয়ে চলে এলো বিবির ঘরের দিকে! ওখানে যুদ্ধ চলছে ওদের—চলুক আরো কিছুক্ষণ। কিন্তু অমর এদিকে এসে কি বিবির সঙ্গেই দেখা করবে? কেমন করে করবে?

অমর এক মিনিট ভেবে বিবির ঘরের বন্ধ দরজাটায় টোকা দিল। ভিতর থেকে প্রশ্ন এলো—কে?

—ডাক্তার!—অমর উত্তর দিল মেয়েলী স্বরে ডাক্তারের অনুকরণ করে। দরজা খুলে গেল তৎক্ষণাৎ! অসীম সাহসী অমর ঢুকে পড়লো ভিতরে। যে প্রহরীটা ওখানে

খোলা ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে ওকে প্রথমতঃ কিছুই বললো না। অমরকে ও নিশ্চয়ই চেনে না—কিন্তু ডাক্তারকে সে তো চেনে! কিম্বা চেনে না? অমর অবাক হয়ে চাইলো লোকটার মুখ পানে; দেখলো, লোকটি অন্ধ! আশ্চর্য্য হয়ে গেল অমর। একটা অন্ধ লোককে কেন এমন গোপন স্থানে পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, কে জানে! ওর চোখ দুটো একেবারে নেই—হয়তো কোনো কারণে উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। লোকটা সংঘাতিক যোয়ান—গণ্ডারের মত তার শক্তি। অমর ভেতর দিকে ঢুকছে—

—গলার আওয়াজটা কেমন যেন···পাহারাওয়ালা শুধুলো অমরকে।

—হুঁ · সর্দ্দি···বলেই অমর আর কোনো কথা না বলে ভেতর দিকে ঢুকে গেল। গলার স্বর অনুকরণ করবার ক্ষমতা কিঞ্চিৎ হয়েছে অমরের—কিন্তু ঐ অন্ধ পাহারাওয়ালা প্রায় ধরে ফেলেছিল তাকে। অন্ধদের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়, জানে অমর। সে মনে মনে ঠিক করলো—স্বর অনুকরণের শক্তিটা আরো বাড়াতে হবে।

ভেতরে ইলেট্রিক আলো জ্বলছে। চেয়ার, টেবিল, ফোন, পাখা—সুন্দরভাবে সাজানো এই ঘরখানা। চারদিকেই চারটি দরজা—অমর ওর একটা দিয়ে ঢুকেছে—অন্য তিন দিকের কোনটায় যাবে, ভাববার সময় নাই। অমর ডান

পাশের দরজায় ঢুকে অন্য ঘরে এসে পড়লো!—সরুমত একটা গলি—তারপরই মস্ত বড় ঘর একখানা—বিরাট লেবরেটরীর মত ঘরখানা। বিস্তর যন্ত্রপাতি আর কুড়ি-পঁচিশজন লোক কাজ করছে সেখানে। মাথা গুঁজে ওরা কাজ করছিল—অমরকে কেউ দেখল কিনা কে জানে। অমর ওঘরে আর না ঢুকে আবার প্রথম দেখা সেই বড় হল ঘরটার বাঁদিকের দরজায় ঢুকলো। ঠিক ওপাশের মত সরু একফালি গলি, তার পরই প্রকাণ্ড একটা হলঘর। আলো জ্বলছে না এঘরে! হলঘরের আলোর সামান্য ছটা মাত্র এসেছে—তাতেই অমর বুঝতে পারলো—ঘরখানা খুবই বড়—বিশেষতঃ উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত। কি আছে ঘরটায়, অমর ভাল করে বুঝতে পারবার পূর্ব্বেই মনে হোল, কারা যেন আসছে এই ঘরেই। ছুটে অমর অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়লো! হঠাৎ হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেল একটা নরম জিনিষের উপর! ওরে বাপ্! একটা মড়া!

ওদিকে যারা এই ঘরে ঢুকছিল—তারা এসেই একটা সুইচ্ টেনে আলো জ্বালালো একটা। অমরের কাছ থেকে অনেক দূরে জ্বললো আলো। অমরের উপস্থিত বুদ্ধি তাকে সাহায্য করলো—সে ঐ মড়াটার সঙ্গে মড়ার মতই পড়ে রইল চুপটি করে। এখন মনে হচ্ছে, ভাগ্যিশ হোঁচট্ খেয়েছিল।

দেখতে লাগলো অমর শুয়ে শুয়ে—তিনজন লোক, একজন বেশ সুন্দর, তার সাহেবী পোষাক—আর দুজন কুলী, তাদের

কাঁধে একখানা ষ্ট্রেচার। ওরা আরো দুটো আলো জ্বাললো; —কিন্তু ঘরখানা এত বড়, আর—অমর তাদের থেকে এত দূরে রয়েছে যে অতদূর থেকে অমরকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যদি ওরা অমরের কাছদিকেই আসে! অমর চোখে শান দিয়ে দেখতে লাগলো—অনেক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এই ঘরটার চারিদিকে—কালো কম্বলের উপর শোয়ানো মৃতদেহ। ওরা সবাই মরেছে, কি আবার ওষুদ পেয়ে বেঁচে উঠবে, কে জানে! অমর তার পাশের মড়াটা নেড়ে দেখলো—বেশ নরম গা, আর গন্ধ হয়নি! তাহলে আবার বাঁচতেও পারে। গতবারে ব্লাড্ ব্যাঙ্কারকে ধরতে এসে অমর ঐ আশ্চর্য্য ওষুদটার খবর জেনে গেছে—ওষুদও কিছু নিয়ে গেছে কিন্তু সে ওষুদ আছে তার কলকাতার বাসায়।

অমর নিঃশাড়ে পড়ে রইল ঠিক মড়ার মত। লোক তিনজন এই দিকেই আসছে। অমরকে ধরেই ফেলবে নাকি! অমর ভয়ে চোখ বুজলো! পায়ের সাড়াটা পার হয়ে গেল— চেয়ে দেখলো অমর,—ওরা অমরকে ছাড়িয়ে আরো খানিকটা দূরে গিয়ে একটি মৃতদেহকে ষ্ট্রেচারে তুলছে। চোখে শান দিয়ে অমর দেখতে লাগলো—মৃতদেহটি মেয়ের! তাহলে সেই রাজকুমারীরই মৃতদেহ নাকি? অমর ভাবতে লাগলো।

ওরা মেয়েটিকে ষ্ট্রেচারে তুলে নিল—দুজন তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর সাহেববেশী লোকটি যাচ্ছে ওদের আগে আগে। কে ঐ সাহেব! বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! অমর তার চোখকে

বিশ্বাস করতে পারছে না! এত দূর থেকে ঠিকই তো চিনেছে অমর, কিম্বা ভুল চিনেছে? সাহেববেশী লোকটি—নিশ্চয়ই তিনি···লালবাবু।

লালবাবু তা হলে মরেন নি,—কোনো রকম ওষুদ খেয়ে মৃতকল্প হয়ে সমাধীস্থ হয়েছিলেন। তারপর যথাকালে সমাধী ভঙ্গ করে আবার শয়তানী আরম্ভ করেছেন! কিন্তু লালবাবু শয়তান—এটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না অমর! অথচ ঐ লোকটি নিশ্চয়ই লালবাবু।

ইতিমধ্যে আলোগুলো নিবিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল। অমর কি করবে ভাবছে। উঠে বসলো। ঘরের যতটা সম্ভব সে তাদের জ্বালা আলোতে দেখে নিয়েছে। দেখেছে, দক্ষিণ দিকে ঘরের মেঝেটা ক্রমনিম্ন হয়ে চলে গেছে—আর উত্তর দিকটা ক্রমোচ্চ! অতএব উঠেই সে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলো! অনেকখানা এসে দেওয়াল—আর যাবার রাস্তা নেই। কিন্তু এইখানেই এই মড়ার ঘরে বন্দী থাকবে নাকি অমর! না—অমর আবার দক্ষিণদিকে নামতে লাগলো! অনেক দূর হেঁটে এল—বহুদূর—আধ মাইল হবে। মাঝে মাঝে ডান দিকের এবং বাঁদিকের দেওয়ালে ধাক্কা লাগছে। ঘরটা তাহলে ত্রিকোণাকার নিশ্চয়। দুই দিক-এর দুইবাহু কোণের সৃষ্টি করেছে—ভেবে অমর উৎসাহিত হয়ে উঠলো! আরো মিনিট দুই হেঁটে পৌঁছালো বন্ধ দেওয়ালের কাছে। কিন্তু একটা লোহার হাতল হাতে ঠেকলো,—অমর জোরে

চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। দেখলো, পার্ব্বত্য নদীটার ঠিক স্রোতের উপরেই গুহার মত এই দরজা। অমর বেরিয়ে পড়লো—অরণ্য, পার্ব্বত্য উপত্যকায়! অমর মুক্ত হয়েছে, রাতও শেষ হয়ে এসেছে।

উষা—অমর গুহা থেকে বেরিয়েই নদীর স্রোতের কাছে এসে পড়ল। জলে-ভেজা স্নিগ্ধ বাতাসে ওর সারা রাত্রির ক্লান্তি যেন ধুয়ে যাচ্ছে। বড় সুন্দর লাগছে এই বাতাসের স্পর্শ। নদীর জল এখন কমে গেছে। এ সব গিরি-নদীর জল এ বেলা বাড়ে তো ও বেলা কমে যায়। অমর বুঝতে পারলো এই নদীর জল যখন পরিপূর্ণ বেগে ছুটতে থাকে তখন ঐ গুহামুখ ছাড়িয়েও চার-পাঁচ হাত উপরে জল উঠে যায়। তখন ইচ্ছা করলে গুহামুখ খুলে গুহার ভেতর জল ঢোকানো সহজ হয়। কিন্তু এই সমস্ত বন্দোবস্ত আধুনিক যুগের নয়, অমর গুহার আকার প্রকার এবং স্থানটার বিচিত্র গড়ন দেখে বুঝতে পারলো। বৌদ্ধযুগের শেষ দিকে বিস্তর সঙ্ঘারাম, বিহার, গুহা ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছিল এই সব পার্ব্বত্য অঞ্চলে; তখন এই দেশ ছিল গভীর অরণ্যভূমি, শ্বাপদ-সঙ্কুল, মানুষের অগম্য স্থান।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ এই সব গুহায় দলবদ্ধভাবে থাকতেন—পরে তান্ত্রিক সম্প্রদায় এই সমস্ত স্থানগুলি অধিকার করে নানারকম অভিচার ক্রিয়া চালাতেন; ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিকেও এ সব স্থানে না-হোত এমন অপকর্ম্ম কিছু নেই। এগুলি তখন দস্যুদের আবাসস্থল হয়ে উঠে ছিল। তারপর অবশ্য বহুদিন এ সব যায়গা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু এখন আবার এই 'বিবির' দল এগুলিকে অধিকার করে নতুন ভাবে দস্যুতা আরম্ভ করেছে। একে আধুনিক সজ্জায় সাজিয়েছে; ইলেকট্রিক টেলিফোন, রেডিও বসিয়েছে—আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

অমর এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নদীর কিনারা দিয়েই হাঁটছে—কিন্তু কোন্ দিকে ও এখন যাবে। নদীর দু-কূলেই উঁচু পাহাড় আর গভীর বন; বাঘ ভাল্লুক আছে কি না, জানা নেই, তবে চোর-ডাকাত যে, আছে তাতে সন্দেহ কিছু নেই। তাছাড়া, ঐ বিবির দলের লোক নিশ্চয় এখনো তার খোঁজ করছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অমরকে এখান থেকে পালাতে হবে।

নদীর জলে নেমে অমর হাতমুখ ধুয়ে নিল—একটা গাছের ডাল ভেঙে দাঁতন করলো। এবার তো কিছু খেতে হয়, কিন্তু খাবার কোথায়? নদীটার ও-পারে গেলে অমর একটু বেশী নিরাপদ হতে পারে, কিন্তু নদীতে কত জল, জানা নেই, তাই নামতে সাহস করলো না। আরো

অনেকখানা হেঁটে চলে এল নদীর কূলে কূলে—তারপর সুবিধামত একটা পাহাড় দেখে উপরে উঠে এসে দাঁড়ালো। পাহাড়ের পর পাহাড় চলে গেছে, যেন পাহাড়ের ঢেউ; তার মধ্যে নানাজাতীয় গাছ—বড় বড় গাছ, ছোট ছোট গাছ, লতা-গুল্ম। অমর এখন কোন্ দিকে যাবে?

কোনোদিকে না গিয়ে অমর একটা পাথরের উপর বসে প্যাণ্টের পকেট থেকে বের করলো সেই পুঁথীর পতাটি—যার দাম সওয়ালক্ষ টাকা। কী এমন মহামূল্য বস্তু আছে ঐ পাতাটায়, দেখতে হবে। অমর পাতাটি মেলে ধরলো—প্রাচীন তুলোট কাগজের উপর গাঢ় কালো কালিতে লেখা পাতাটির দুই পৃষ্ঠাই। অক্ষর বাংলা হরফ্ কিন্তু প্রাচীন কালের বাংলাহরফ—অমর অতি কষ্টে কয়েকটা মোটামুটি কথা পড়লো—"মৃত কল্প করণ"—"পুনর্জীবন দান"—পক্ষব্যাপী মৃত্তিকাগর্ভে বাস" —নৃমুণ্ড — 'শব-শয়ন,—শ্মশান-পূজা...'। অমর বহু চেষ্টা করেও ভেতরের ছোট লেখাগুলি পড়তে পারলো না। পুঁথীর নাম বেশ বড় অক্ষরে পাতার মাথায় লেখা রয়েছে—"ভল্লুক তন্ত্রম্—পাতাল খণ্ড।"

অমর শুনেছে আগেকার দিনে তান্ত্রিকগণ নাকি মরা মানুষকে বাঁচাতে পারতেন। পারাকে সোনা করে দিতে পারতেন, হাজার মানুষের চোখের উপর অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন—এই পুঁথীটাতে নিশ্চয় সেই সব সাধনার প্রক্রিয়ার কথাই লেখা আছে। কিন্তু এ সব ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সত্য

কিছু আছে কিনা, আজ পর্য্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক সেটা অনুসন্ধান করেছেন বলে জানা নেই অমরের। হয় তো, এই বিবি এবং তার দল এই তান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছে এবং তারই জন্য পুঁথীর এই পাতাটির এত দাম। এ পুঁথী যে খুবই দুষ্প্রাপ্য, সেটা বুঝতে অমরের দেরী হোল না এবং সে অনুমান করলো—নিশ্চয় এই পুঁথী থেকেই কোনোরকম ওষুদের ফরম্যুলা আবিষ্কার করে মানুষকে দু'চার দিনের মত মৃতকল্প করে রাখবার ওষুধ আবিষ্কার করেছে এই বিবি! পাতাটি পরম যত্নে আবার প্যাণ্টের পকেটে রাখলো অমর।

অনেকক্ষণ বিশ্রাম করলো অমর; এইবার যেতে হবে, কিন্তু কোন্ দিকে গেলে ও পথ পাবে, লোকালয়ে যেতে পারবে, কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ওর কেবল ভয় হচ্ছে, আবার যদি সে জাগুয়ারের আস্তানাতেই গিয়ে পড়ে তো ওকে আর বেঁচে ফিরতে হবে না। অমর আকাশের পানে চাইল। চারিদিকেই উঁচু পাহাড় আর বন, মাথার উপর নীল আকাশটার কিছু দেখা যায় মাত্র। যে-কোনো একদিকেই তো যাওয়া চলে না—অমর নদীর কিনারা ধরেই হাঁটছে। কিন্তু রাস্তা বড় দুর্গম—ক্রমাগত উচু নীচু পাহাড়, কাঁটাঝোপ, বন। হঠাৎ অমর দেখতে পেল,—ডানদিকে একটা কুণ্ডলাকৃতি ধোঁয়া উঠেছে আকাশের দিকে। বিশেষ লক্ষ্য করে দেখলো, ধোঁয়াটা সচল। নিশ্চয় রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের ধোঁয়া। শব্দও

শুনতে পেল অমর। জয়-মা কালী! অমর ডানহাতি বাঁক ফিরলো ঐ রেল লাইনটা ধরবার জন্য। প্রায় আধমাইল হেঁটেই দেখতে পেল, পাহাড় কেটে রেলপথ বসান হয়েছে—উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে রেলপথ। অমর নেমে এসে দাঁড়ালো রেলপথের উপর। এখন কোন্ দিকে গেলে ষ্টেশনটা কাছে হবে? অমর দেখলো—টেলিগ্রাফের তারের খুঁটো রয়েছে, তাতে মাইল লেখা—এই মাইলের অংক নিশ্চয় হাওড়া থেকে আরম্ভ হয়েছে, অনুমান করে অমর বুঝতে পারলো—দক্ষিণ দিকে গেলে তাকে প্রায় সাড়ে চার মাইল হাঁটতে হবে, আর উত্তর দিকে উজিয়ে গেলে হাঁটতে হবে মাত্র দেড় মাইল কি দুমাইল, কারণ পাঁচ ছয় মাইল পর পর ষ্টেশন থাকবার কথা। অমর উজিয়ে উত্তর দিকেই হাঁটতে লাগলো—অল্প হেঁটেই ষ্টেশন পাবে আশায়, কিন্তু রশি খানেক গিয়েই তার মনে হোল, সে ঐ দিক থেকেই এসেছে—অতএব সেই জাগুয়ারের দলের আড্ডা নিশ্চয় উত্তর দিকেই; তারা অমরের খোঁজে ষ্টেশনে গুপ্তচর পাঠাতে পারে। না, —অমর অত বোকামী করবে না। সে ফিরে আবার দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগলো—হোক পাঁচ-মাইল, সে এখন একটু বেশী সাবধান হতে চায়।

খিদে পেয়েছে অমরের, কিন্তু খাবার মত কোনো ফল সে দেখতে পেল না কোনো গাছে। অজস্র ফুল অবশ্য ফুটে রয়েছে। মাইল খানেক হেঁটে একটু সমতল মত যায়গায় এসে

দেখলো, রাখাল ছেলেরা মহিষ-গরু চরাতে এসেছে। ওদের একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলো, যায়গাটার নাম 'কদ্মা টাঁড়্।' ষ্টেশন এখনো অনেক দূরে। অমর আর কি করবে —গাছের একটা ডাল ভেঙে মাথার রোদ আড়াল দিয়ে হাঁটতেই লাগলো রেল-লাইনের পাশে পাশে।

লাল বাবুর লাস খুঁজতে এসে ওর খুব হয়রানিটা হোল যা হোক! কিন্তু লালবাবু তো মরেন নি—মৃতকল্প হয়ে সমাধিস্থ হয়েছিলেন মাত্র, কারণ, গত রাত্রে সাহেবী পোষাক পরা লালবাবুকে অমর দেখেছে। কিন্তু অমরের ভুল হতে পারে। হয় তো তিনি লালবাবু নন—কিন্তু এতবড় ভুল হওয়া উচিত নয় অমরের। তিনি নিশ্চয় লালবাবু। কিন্তু তিনি কেন মৃতকল্প হয়ে সমাধিস্থ হয়েছিলেন? এখানে এই জাগুয়ারের আস্তানাতেই বা তিনি কি জন্য এসেছেন—আর কি কাজ করছেন? অমর ব্লাড়-ব্যাঙ্কারের ঘটনা থেকে পর পর চিন্তা করে গেল সব ঘটনাগুলোই। লালবাবু নিতান্তই রহস্যময়। কলকাতায় গিয়ে ওঁর বাড়ীতে একবার খোঁজ করবে অমর; জানতে হবে লালবাবু সত্যি কি?

খুবই ক্লান্ত হয়েছে অমর, কিন্তু আনন্দও ওর কম হচ্ছে না। এবারকার অভিযানে ও কারো সাহায্য নেয় নি—এমনকি মিঃ শিকদার বা মীনুকে পর্য্যন্ত বলে আসেনি যে সে লালবাবুর লাসের সন্ধানে যাচ্ছে। বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করবার জন্য এবার কেউ আসতো না; কিন্তু বিপদ

কাটিয়ে অমর এখন মুক্ত। ঐ তো ষ্টেশন্—অমর এসে পড়েছে। এবার টিকিট করে সটান কলকাতা। কিন্তু টিকিট কিনবে কি দিয়ে? অমরের কাছে সেই পুঁথীর ছেঁড়া পাতাটা ছাড়া আর একটা কানা কড়িও নেই। পাতাটার দাম সওয়া লক্ষ টাকা, কিন্তু নিচ্ছে কে এখন? গোটা পাঁচেক টাকা পেলেই অমর এখন ওটা বেচে ফেলে টিকিট কিনে কলকাতা যেতে পারে। কী হবে ও পাতাটায়? অমরের কোনো কাজে লাগবে বলে তো মনে হয় না।

ছোট্ট ষ্টেশনটি—অমর এসে দাঁড়ালো। গাড়ী আসবার দেরী আছে—অমর ষ্টেশন মাষ্টারকে জানালো—অমরের সব চুরি হয়ে গেছে—মাষ্টারমশাই তার কলকাতা যাবার কোনো সুবিধা করে দিতে পারেন কি না! মাষ্টার জানালেন যে তিনি পারবেন না। অমর মুস্কিলে পড়লো। ট্রেণের সময় হয়ে আসছে—অনেক লোক আসছেন ট্রেণ ধরবার জন্য; তাঁরা টিকিট কিন্ছেন; অমর আরো দু'একজনকে জানালো, আবেদন করলো সাহায্যের জন্য—কেউ ওকে দুটো পয়সা দিয়েও সাহায্য করলো না। নিরাশ হয়ে অমর ঠিক করলো—ট্রেণে উঠে পড়বে, তার পর যা থাকে কপালে।

ঠিক সেই সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে উঠলেন ষ্টেশনে। সুন্দর চেহারা। চোখে সুরমা লাগনো—চুলগুলি সাদা, আর আপাদ-মস্তক সাদা পোষাকে তাঁকে বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল। দাঁতগুলি কি সুন্দর ঝক্মক্ করছে, যেন মুক্তা!

অমর তাঁর কাছে সাহায্য চাইবে কি না ভাবছে। উনিও অমরের পানে চাইলেন ছ'একবার। অমর কাছে এসে বললো,

—আপনি কোথায় যাবেন ?

—কলকাতা, তুমি যাবে কোথায় ?

—আমিও তো যাব কলকাতা, কিন্তু ভারী মুস্কিলে পড়ে গেছি—!

—মুস্কিল কিসের ?—ভদ্রলোক শুধুলেন।

অমর তাঁকে জানালো যে তার সব চুরি হয়ে গেছে। টাকার অভাবে সে টিকিট কিনতে পারছে না। ভদ্রলোকটি অত্যন্ত দয়ালু।—আহাহা! তাই অমন মুখশুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ! এসো, আমি তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি!—তিনি সস্নেহে অমরের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপর ছুখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনলেন,—একটা নিজের, অন্যটি অমরের।

থার্ড ক্লাসের ভাড়া ছিল না—একেবারে সেকেণ্ড ক্লাস। উঃ! অমর কিন্তু ভাগ্যবান নিশ্চয়! অমর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ীতে উঠলো ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে। কামরাটা প্রায় খালি—আরামে বসলো দুজনে।

ভদ্রলোক অমরকে শুধুলেন—চুরি কেমন করে হোল ? কোথায় চুরি হোল ?

সব কথা সত্যি বলবার ইচ্ছা নেই অমরের; কিন্তু এতবড় উপকার যিনি করলেন, তাঁকে মিথ্যা বলে ঠকাতেও

ওর ইচ্ছে হোল না, তাই যতদূর সম্ভব সত্য গোপন করে বললো সে—পাহাড়ের একটা উপত্যকার মধ্যে গুহা দেখে সে ঢুকে পড়েছিল; সেখানে আছে ডাকাতের আড্ডা। তারা মানুষ খুন করে না, মানুষকে ধরে এনে রক্ত বের করে নেয়। তারপর কয়েক্‌দিন রেখে আবার ছেড়ে দেয়—কাউকে-বা আত্মীয়রা টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। কেউ কেউ অবশ্য মরেও যায়। অমর কোনোরকমে জানতে পেরে পালিয়ে এসেছে কিন্তু তার পূর্ব্বেই ওরা তাকে বন্দী করে তার যথা স্বর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল।—অমর যতদূর সম্ভব সঙ্ক্ষেপে এই আধাসত্য কথাটুকু জানালো। ভদ্রলোক আগ্রহ প্রকাশ করে শুধুলেন,

—ওদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছ?

—আজ্ঞে না—বিশেষ কিছু নয়। তবে, আমার মনে হোল, কোনোরকম গোপন ওষুধ তৈরী করবার চেষ্টা করছে ওরা—হয়তো কিছু কিছু তৈরীও করেছে—যে ওষুদ মানুষকে দু'এক দিনের মত মৃতকল্প করে রাখতে পারে। এ ওষুদে ওদের কি কাজে লাগবে ওরাই জানে—তবে আমি একখানা পুঁথীর পাতা ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছি—তাতে ঐ সব তান্ত্রিক ওষুদ-পত্রের কথা লেখা আছে।

—তুমি পাতাটা কি ভাবে পেলে?

—ওখানে একজন ডাক্তার আর একজন, তার নাম জাগুয়ার—ঐ পাতাটি নেবার জন্য ওখানকার একটি মেয়েকে

টাকা দিতে চাইল, মোটা টাকা, এক লক্ষটাকা। কিন্তু মেয়েটি চাইল টাকাটা নগদ। এই নিয়ে ওদের ঝগড়া মারামারির সময় মেয়েটি এই পাতাখানা যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, আমি দেখেছিলাম—সেই সুযোগে ওটা কুড়িয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছি। ঐ জাগুয়ার আর, ডাক্তার নিশ্চয় ওদের দলপতির সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে চাইছে। ওদের কথা থেকেই সেটা বুঝতে পারলাম।

—দলপতিকে দেখ নি তুমি?

—আজ্ঞে না! তাঁর নাম জানি—বিবি। B. B. "ব্লড্—ব্যাঙ্কার"

—তাঁকে পেলে তুমি কি পাতাখানা তাঁর হাতে দিয়ে সব বলতে নাকি?

—হয়তো বলতাম।—অমর হেসে বললো—কারণ, ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার কোনো উপায়ই আমার জানা ছিল না। দলপতিকে বলে তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে হোত। সৌভাগ্য-ক্রমে আমি বেরুনর পথ পেয়ে গেলাম।

—কিন্তু একজন ডাকাত তোমাকে করুণা করতো, এটা মনে কর কি বলে!

—ওঁকে চোখে দেখিনি, কিন্তু ওঁর কাজের কিছু পরিচয় জানা আছে আমার। সাধারণ চোর-ছ্যাঁচড়-ডাকাত তিনি নন—; অমর কথা বলে একটু থামলো, তারপর আবার বললো—আরো কয়েক বছর আগে আমি একজন ডাকাতের

হাতে পড়ে ছিলাম, তিনি ডাকাত, কিন্তু তাঁর মতন মহৎ দস্যু মানব-সমাজের গৌরব। তাঁকে আমরা "কিউ কাকা" বলি। আমার মনে হচ্ছে, এই বিবি, আমার সেই কিউ কাকা! অমর যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো বলতে বলতে। লোকটি হাসলেন। পরের ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ালো, তিনি খাবার কিনে দিলেন অমরকে। খাওয়া হলে বললেন—যাও, শোও গে। ঘুমাও কিছুক্ষণ। অমর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। উঠে দেখে রাত্রি নয়টা; হাওড়ায় গাড়ী দাঁড়িয়ে, কিন্তু কামরায় সেই ভদ্রলোক নেই। অমর উঠে বসেই প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, পুঁথীর পাতাটি নেই। তার বদলে রয়েছে একখানি চিঠি, ট্রেণের টিকিট, আর দুটি নগদ টাকা। কে এই ভদ্রলোক।

অমর গাড়ী থেকে নেমে এল।

ষ্টেশনের বাইরে এসেই অমর একটা আলোর কাছে দাঁড়িয়ে চিঠিখানা খুললো। সুন্দর হস্তাক্ষর; অমরকেই লেখা চিঠিখানি। অমর পড়ছে :

স্নেহের অমর,

গোয়েন্দা হতে হলে যে-সব গুণ দরকার তার অনেকগুলিই তোমার আছে, কিন্তু পাকা গোয়েন্দা হতে হলে যে-গুণটি সব চেয়ে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে

নিজের কোনো ভালমন্দ মতামত পোষণ না করা; কারণ তুমি জান না, খুব ভাল মানুষের মধ্যেও খুব মন্দ মন যেমন থাকতে পারে—অতি মন্দ লোকের মধ্যেও তেমনি অতিশয় ভালো কোনো গুণ থাকা আদৌ অসম্ভব নয়। কিন্তু গোয়েন্দার এসব দেখলে চলে না। তাকে দেখতে হবে—যে বিশেষ ঘটনার সূত্র ধরে গোয়েন্দা ঐ লোকটির সংস্পর্শে এসেছে, সেই ঘটনার সঙ্গে লোকটির সম্পর্ক কোথায়! লোকটির অন্তর, বা উদ্দেশ্য খুবই হয়তো মহৎ, কিন্তু গোয়েন্দার সে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। গোয়েন্দা শুধ্ প্রমাণসহ আবিষ্কার করবে, বিশেষ সেই ঘটনার কোন্ অংশের সঙ্গে ঐ লোকটির বিশেষ কাজটির সম্পর্ক কি!

ধৈর্য্য, সাহস এবং তৎপরতা তোমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু তুমি এখনো খুবই ছেলেমানুষ, তাই বড় বেশি উচ্ছ্বাস প্রবণ। গোয়েন্দার কাজে উচ্ছ্বাসের ঠাঁই নেই। তুমি বড় শীঘ্র মানুষকে বিশ্বাস কর—বিশ্বাস গোয়েন্দারা ততক্ষণ করবেনা কাউকেই, যতক্ষণ পূর্ণ প্রমাণ সে না পাবে। চাক্ষুষ প্রমাণকেও তুমি অবিশ্বাস করবে—কারণ তোমার চোখ ভুল দেখতে পারে! পাকা বদমায়েসরা গোয়েন্দাকে বিভ্রান্ত করে এই ভাবে।

যাই হোক, তুমি যেপথে চলেছ, সেটা খুবই ভাল পথ। তুমি একদিন ভাল গোয়েন্দা হবে বলেই আমি আশা করি, এবং. আশীর্ব্বাদ জানাই। ইতি

তোমার—কিউ-কাকা।

কিউ কাকা!—অমর অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করলো কথাটা। কোথা থেকে এলেন কিউ-কাকা! ঐ পুথীর পাতার সঙ্গে তাঁর যোগ কোথায় এবং কেন তিনি অমরকে টিকিট কিনে ট্রেনে তুলে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে সেই পাতাটি নিয়ে গেলেন! অমর ভাবতে ভাবতে ষ্টেশনের বাইরে এসে ট্রামে চড়ে বাড়ী ফিরলো!

মিঃ শিকদার তখনো কলকাতায় ফেরেন নি। মীনু বললো,
—ক'টা আসামী ধরলে অমরদা!
—ধরিনি—ঘাটে চার ফেলে এসেছি—এবার ছিপ্ ফেলতে হবে।

বলেই অমর ওকে কাটিয়ে দিয়ে জ্যেঠাইমার কাছে গিয়ে কিছু খেল, তারপর শুলো! শুয়ে শুয়েও অনেক রকম ভাবনা ভাবলো অমর। কিন্তু শেষটায় ঘুমিয়ে গেল। পরদিন সকালেই ঘুম ভাঙ্গতে ওর মনে হোল,—লালবাবুর এখানকার বাড়ীটায় একবার গিয়ে সে জানবে, লালবাবু কোথায়?

হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে অমর চলে গেল লালবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীতে। গেটে দারয়ান। অমর তাকে সেলাম দিয়ে শুধুলো,—লালবাবু কি বাড়ীতে আছেন!

—না—পরশু রাত্রে আসবেন!

—তাহলে, বাড়ীতে এখন কে আছেন? বিশেষ জরুরী

দরকার আছে আমার। লালবাবুর স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে কিম্বা আর কেউ যদি থাকেন ?

—বাবুর তো স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কিছু নেই। তিনি তো বিয়েই করেন নি। বাড়ীতে আছেন দুজন লেবরেটরী এ্যাসিটেন্ট, একজন সেক্রেটারী আর ঠাকুর, চাকর, দারয়ান। তাছাড়া আছে দুটো কুকুর। দিনের বেলা তারা শেকলে বাঁধা থাকে। অমর ইচ্ছে করলে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে পারে !

ইচ্ছেই করলো অমর। ভেতরে ঢুকে একটা চাকরকে বললো,—সেক্রেটারীবাবুর কাছে নিয়ে চলো।

দোতালায় সুন্দর করে সাজানো একটি ঘরে এলো অমর চাকরটার সঙ্গে। পর্দা ঠেলে অন্য ঘরে গিয়ে দেখে চমৎকার চেহারার একটি ভদ্রলোক বসে বসে কি সব লিখছেন ! ঘরের চারদিকের দেওয়ালে কয়েকখানি বিলাতী ছবি—দৃশ্যচিত্র। সুন্দর মেহগ্নি কাঠের আসবাব্ এবং অনেকগুলি ঝক্‌ঝকে বই রয়েছে বুকশেল্‌ফ্‌এ। অমর একবার চোখ ফিরিয়েই সব দেখে নিয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলো,—লালবাবু কি বাড়ীতে নেই ?

—না ; উনি পরশু রাত্রে আসবেন বেনারস থেকে। কি দরকার তোমার ?

—উনি আমাকে একদিন আসতে বলেছিলেন এখানে !

—বেশ তো,—মঙ্গলবার উনি আসবেন, তুমি বুধবার সকালে দেখা করো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করবো !

বলে অমর চুপ করে রইলো। এইবার তার উঠে চলে আসা উচিৎ নমস্কার জানিয়ে ; কিন্তু সে বসে রয়েছে দেখে সেক্রেটারী বললেন,—আর কিছু বলছো ?

—হ্যাঁ, ও'র খবর কি তুএকদিন মধ্যে পেয়েছেন আপনি ?

—না—পাঁচ সাত দিন খবর পাইনি ; কিন্তু খবর না দেবার কথা উনি বলেই গেছেন। কেন, বলো তো ?

—কিছু না ; ওঁর শারীরিক সুস্থতার কথা জানতে চাইছিলাম !

—উনি ভালই থাকবেন। বলে মৃত্ হাসলেন সেক্রেটারী ! বললেন—তোমার শিকদার-জ্যেঠামশাই কবে ফিরছেন ?

—ঠিক নেই, দেরী হতে পারে। শিকারপুরের রাজকন্যার ব্যাপার নিয়ে উনি গেছেন শিলংএ ;—অমর বললো এতগুলো কথা। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বললো।

—শিকারপুরের রাজকন্যার কি হয়েছে ? সেক্রেটারী শুধুলেন !

—কে জানে, কারা নাকি শিকার করে নিয়ে গেছে তাকে !

বলেই অমর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সেক্রেটারীর মুখপানে। শিকারপুরের রাজকন্যার সম্বন্ধে এই সেক্রেটারী কিছু জানেন কি না, সেইটা জানাই অমরের উদ্দেশ্য ! কারণ, তার নিশ্চিত ধারণা জন্মেছে—গুহার মধ্যে যে মেয়েটিকে জাগুয়ার আর ডাক্তার তুলে আনলো সেদিন, সে নিশ্চয় শিকারপুরের

রাজকন্যা। মিঃ শিকদার তারই অনুসন্ধানের জন্য আহূত হয়েছেন এবং প্রায় মাসাধিককাল অনুসন্ধান করেও কিছুই করতে পারেন নি! কিন্তু সেক্রেটারীর মুখের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি বললেন—পাকা গোয়েন্দা উনি, নিশ্চয় ধরে ফেলবেন শিকারীদের।

—লোকটা ব্যাঙ্গ করলো কি না, অমর বুঝতে চাইছে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। সেক্রেটারী এতক্ষণে বললেন, —চা খাবে অমর? খাও; এসো, আমি এখনো চা খাইনি।

অমর চায় আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে এই বাড়ী এবং বাড়ীর লোকজনকে দেখতে। তাই রাজি হয়ে বললো, —চলুন, খাওয়া যাক।

ওদিকের বারন্দায় টেবিল চেয়ার পেতে প্রাতরাশের অয়োজন করা হয়েছে। অমরকে নিয়ে সেক্রেটারী চা খেতে বসলেন। চা-রুটি-মাখন, ডিমসেদ্ধ,—ফল কিছু; বেশ উপাদেয় আহার্য্য। অমর অবশ্য বাড়ীতে খেয়ে এসেছে, তবু এমন সুন্দর খাবারগুলো সে অগ্রাহ্য করলো না। বেশ আরাম করে খেতে লাগলো। সেক্রেটারি ওর সঙ্গে কথা বলছেন—এর পর তুমি এম-এ পড়বে; কেমন?

—ঠিক নেই! নাও পড়তে পারি। কিছু বিজ্ঞান পড়বার ইচ্ছে আছে। লালবাবু বলেছিলেন, আমাকে সাহায্য করবেন।—অমর জানালো।

—তাহলে তো আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হয়।

—হ্যাঁ, তিনি বলেছেন যে আমাকে তিনি এখানকার লেবরেটারীতে শিক্ষানিবিশ রেখে দেবেন। কোথায় আপনাদের লেবরেটারী ?

—আছে নীচেতালায়—বলে সেক্রেটারী অমরের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আধ মিনিট। ঠিক সেই সময় একখানা লরী এসে ঢুকলো নীচের বাগানের হাতায়—লরীটা বাড়ীর পিছন দিকে চলে গেল। অমর সেই খোলা লরীটার ওপর একখানা মস্ত লম্বা কাঠের বাক্স পড়ে থাকতে দেখলো। ট্রেনে বুক করে বাক্সটা আনা হয়েছে—রেলের লেবেলও লাগানো রয়েছে ওতে। এই মাত্র হয়তো ষ্টেশনে নেমেছে, তারপরই লরীতে চাপিয়ে ঘরে আনা হলো। হয়তো কোনো ঔষধপত্র বা লেবরেটারির যন্ত্রপাতি এলো ওটাতে কিন্তু অমর ঐ বাক্সটার একপ্রান্তে কালো সূতোর মত একটু কি যেন দেখতে পেয়েছে। কি ওটা? রেশমের বাণ্ডিলও হতে পারে। কিন্তু রেশমের বাণ্ডিল অত যত্নে প্যাক্ করে কাঠের বাক্সের মধ্যে আনার কি দরকার? ব্ল্যাকমারকেট করে নাকি এরা? কিম্বা ওটা হয়তো ভেতরের যন্ত্রটার কোনো অংশ, প্যাক করার সময় অসাবধানে সামান্য বেরিয়ে পড়েছে—ও নিয়ে ভেবে কি হবে ?

—লেবরেটারি দেখতে চাও তুমি ? সেক্রেটারী বললেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—অনুমতি পেলে দেখতাম।

অমর এতো বেশী বিনয়ের সঙ্গে বললো কথাটা যে সেক্রেটারী বেশ খুসী হয়েই বললেন—চল, দেখাচ্ছি।

ঐ বাক্সটাই দেখবার ইচ্ছা অমরের। তাই সে আনন্দিত হোল। কিন্তু সে-ভাব গোপন করে বললো—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

চা খাওয়া শেষ হলে দুজনে নীচে নামলো। মস্ত বড় ঘর নীচে। বিস্তর যন্ত্রপাতি, বড় বড় টেবিলে রাখা নানান রকম কাচের জার—টিউব, ফানেল, নিক্তি,—কতরকমের শিশি বোতল। বিরাট লেবরেটরী। অমর শুধুলো,—এখানে কিসের গবেষণা করা হয় ?

—ঔষদের। মানুষের জীবনকে বাড়াবার জন্য অমৃত তৈরী করবার চেষ্টা করা হয়।

—তা কি হয় কখনো ? মানুষ কি ওষুদ খেয়ে অমর হবে ?

—হবে। আমাদের এই ভারতেই প্রাচীন দিনে বহু অদ্ভুত ওষুদের আবিষ্কার হয়েছিল—তার মধ্যে অমৃত প্রস্তুতের সংকেতও ছিল।

অমর চুপ করে রইল ; তার পাওয়া সেই পুঁথীর পাতার সঙ্গে সেক্রেটারীর কথার যেন বেশ সংযোগ রয়েছে। কিন্তু পাতাটা তো চুরি হয়ে গেছে ! অমর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো সব। এ ঘর থেকে আরেক ঘরে এসে দেখলো, এ্যাপ্রোনপরা একজন চুলদাড়ীওয়ালা লোক গভীর মনোনিবেশে সরু সরু টিউবে ওষুদ ভরছেন আর গ্যাসের শিখায় টিউবের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছেন। ওগুলি এম্পুল। অমর সবিস্ময়ে দেখলো—ঐ রকম এম্পুলই তো গতবারে বিন্ধ্যাচলের

আরোগ্যনিকেতনে পেয়েছিল, এবং তাই ইন্‌জেক্‌সান দিয়ে মীনুকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু এই এম্পুলটা হচ্ছে দুই নম্বরের। এক নম্বরের এম্পুলও নিশ্চয় এখানেই তৈরী হয়। অতএব বেশ বোঝা যাচ্ছে—বিন্ধ্যাচলের গুহার ব্যাপারের সঙ্গে এই লালবাবুর এবং তার লেবরেটারীর বেশ যোগ আছে। তাহলে কি লালবাবুও এই দলের একজন বিশেষ ব্যাক্তি—তিনিই কি সর্দ্দার নাকি?

কিন্তু অমরের চিন্তা অধিকদূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই সেক্রেটারী বললেন—চলো, ও ঘরটাও দেখ।

অন্য ঘরে এসে অমর দেখলো একজন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক বসে অন্য একরকম এম্পুল তৈরী করছেন। এটা এক নম্বর। এই ঘরটার পাশেই প্রকাণ্ড গুদামঘর। দুজন লোক লরী থেকে কাঠের বাক্সটা নামিয়ে ঐ গুদামঘরে রাখলো—অমর খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল, আরো তিন চারটা বড় বড় কাঠের বাক্স পড়ে রয়েছে ওখানে। এখুনি যেটা আনা হোল, সেইটা ওদের একটার উপরেই রেখে দেওয়া হোল। কালো রেশমের মত সেই বস্তুটি অমর আবার দেখতে পেল। গুদাম বন্ধ করে চলে গেল লোক দুজন। অমর এবং সেক্রেটারী এবার উপরে আসবে, কিন্তু অমর দেখে নিতে চায়, এই বাড়ীতে ঢুকবার বা বেরুবার অন্য কোন রাস্তা আছে কি না। গুদামঘরটায় যে পথে কাঠের বাক্সটি বয়ে আনা হোল, অমর সেই দিকে একবার এসে দেখে নিল যে ওটা

বাড়ীর পেছন দিক। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পুরানো আমলের একটা পাথরের মূর্ত্তি ভাঙ্গা হয়ে পড়ে আছে, আর একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণচুড়ার গাছ। বেরুবার বা ঢুকবার পথ ওদিকে নেই। ভাঙ্গা মূর্ত্তিটা দেখে অমর বলল—আহাহা! এমন সুন্দর ষ্ট্যাচুটা ভাঙ্গলো কেমন করে?

—ও সেই পুরানো আমলের—বলে সেক্রেটারী হাত ধরলেন অমরের। অমরকে তিনি ঐ ষ্ট্যাচুটার কাছে যেতে দিতে চান না নাকি? অমর যেন কিছুই বোঝে নাই, এমনি ভাব দেখিয়ে বললো,—এই বাড়ীটা শুনেছি একসময় নীলকুঠির এক সাহেবের বাংলো ছিল।

—তা হবে—এসো—বলে সেক্রেটারী ওকে টেনেই যেন উপরে নিয়ে গেলেন। অমর আর অল্পক্ষণ থেকে বাড়ী চলে গেল।

শিকাদার মশায় প্রায় মাসাধিককাল বাড়ীছাড়া। শিকারপুরের মহারাজা বাহাদুর অসুস্থ হয়ে তাঁর শিংলংএর বাড়ীতে হাওয়া বদলাতে এসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, একমাত্র কন্যা ইন্দিরা আর বাড়ীর বিশ্বস্ত চাকার-দারয়ান। কন্যার বয়স মাত্র পনর বছর। বেশ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়ে। জীবনে সে কারো কোনো অনিষ্ট করে নি। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা দেখা গেল, সে তার বিছানায় নেই। রাত্রে খাওয়ার পর

শুয়েছিল ঘরে খিল দিয়ে। দরজার খিল যেমনকার তেমনি বন্ধ রয়েছে। অথচ মেয়েটি ঘরে নেই। মহারাজা এবং মহারাণী তাঁদের একমাত্র কন্যার অন্তর্দ্ধানে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। পুলিস এলো—যথারীতি অনুসন্ধানও হোল, কিন্তু কিছুই কিনারা হোল না। অসুস্থ মহারাজা আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

খবরের কাগজে পুরস্কার ঘোষনা করা হোল লক্ষ টাকা। বড় বড় গোয়েন্দা লাগানো হোল মেয়েকে খুঁজে বের করবার জন্য কিন্তু প্রায় দেড়মাস হয়ে গেল, কিছুই সন্ধানের সূত্র মিলল না। তখন ওঁরা মিঃ শিকাদারকে 'তার' করলেন, মেয়েটিকে খুঁজে বের করে দেবার জন্য; কিন্তু মিঃ শিকদারও এই একমাস ধরে অনুসন্ধান করেও কিছু করতে পারছেন না। তাঁর বাড়ীর লোক বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। মীনু বাবার জন্য কাঁদতে আরম্ভ করেছে। অমরও বিশেষ রকম ভাবছে।

মিঃ শিকাদার শিলংএ এসে বহু তথ্যই সংগ্রহ করলেন। শুনলেন যে মহারাজার এই বাড়ীখানি ছিল জনৈক ধনীব্যক্তির। তিনিই এটি মহারাজাকে বিক্রী করেছেন এবং কলকাতায় নতুম বাড়ী কিনে এখন বাস করছেন। সে লোকটির নাম মিঃ এল্, বি, চৌধুরী অর্থাৎ লালবিহারী চৌধুরী। মিঃ শিকদার তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জানলেন যে তিনি আমেরিকাফেরৎ ডাক্তার—বিপত্নিক এবং অতিশয় সজ্জন

ব্যক্তি। বিনামূল্যে বিস্তর লোককে চিকিৎসা করে তিনি এখানকার সকলের প্রিয় হয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হোল, বাড়ী বিক্রী করে কলকাতা চলে গেলেন। সেখানে এখন কি করছেন, এখানকার কেউ জানেন না।

বাড়ীখানা একটু বিশেষ ধরনের তৈরী। নতুন রকম তার ডিজাইন এবং দরজা-জানালা বিশেষ রকম পোক্ত। সহজে তার মধ্যে চোর ডাকাত ঢুকতে পারবে না, এমন ভাবেই তৈরী। মিঃ শিকদার ইন্দিরার শোবার ঘরটার চারিদিক দেখলেন এবং বাগানটারও চতুর্দিক অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু চোর কোন্ পথে ইন্দিরাকে চুরি করেছে, কিছুই বুঝতে পারলেন না। এ যেন ভুতুড়ে কাণ্ড। অথচ ভুতের অস্তিত্বে বিশ্বাস কখনো তিনি করেন না। দূরের এবং কাছের পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদিও খোঁজা হোল। মেয়েটির সব বন্ধুবান্ধব চেনা পরিচিতকে জিজ্ঞাসা করা হোল, কিছুই জানা গেল না। চোরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কিছু যখন বোঝা যাচ্ছে না, তখন চুরীটা কেন হোল, এই কথাই মিঃ শিকদার ভাবছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হোল, ঐ মেয়েটিই শিকারপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী। ওকে সরিয়ে ফেলতে পারলে আর কেউ সে-রাজ্যের গদি পেতে পারে কি না জানা দরকার। তিনি মহারাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং জানলেন, যে সে রকম কোনো লোক নেই। তাহলে মেয়েটিকে কে চুরি করলো, কিম্বা সে নিজেই কোথাও বেড়াতে গিয়ে খালে-খন্দে পড়ে

মারা গেছে। কিন্তু অতবড় রাজ্যের রাজকন্যা একলা কোথাও বেড়াতে যায় না। সবসময়ই তার কাছে আয়া থাকে। রাত্রেও আয়া বাইরের বারান্দায় শুয়ে থাকে—চুরীর রাত্রেও ছিল, তবে সে কোনো কিছু জানতে পারে নি! মিঃ শিকদার সব দেখে শুনে নিরাশ হয়ে পড়ছেন।

বহু রকমে বহু তথ্য সংগ্রহ করেও যখন কোনো সূত্র মিললো না—তখন একদিন নিতান্ত নিরাশ হয়েই তিনি ইন্দিরার শোবার ঘরখানা পরীক্ষা করে সিড়ি দিয়ে নেমে আসছেন—হঠাৎ সিড়িতে একটা গন্ধ যেন তাঁর নাকে লাগলো। গন্ধটা কোত্থেকে আসছে? তিনি চারদিকেই তাকালেন—বুঝতে পারলেন না। দেওয়ালগুলো শুঁকলেন,—কিছু বোঝা গেল না—তখন সিড়িতে বসে সিড়ির পৈঠা শুঁকলেন—গন্ধটা অত্যন্ত উগ্র হয়ে বেরুচ্ছে। তৎক্ষণাৎ লোক ডেকে তিনি সিড়ির পাথরের পৈঠা তুলতে বললেন।

তোলা হোল পৈঠা—দু'তিনটে পৈঠা তোলার পর সিড়ির নীচে একটা কূপ বেরিয়ে পড়লো। মিঃ শিকদার অন্ধকার সেই কূপের মধ্যে টর্চ্চের আলো ফেলে দেখতে পেলেন, একটা পচা গলিত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে—ইন্দিরারই দেহ নাকি?

উনি তৎক্ষনাৎ নেমে গেলেন কূপের মধ্যে—তুলে আনলেন দেহখানা! পচে গলে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে, শুধু বুঝতে পারা যায় চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ের মৃতদেহ। তাহালে ইন্দিরারই দেহ। মহারাণী আছাড় খেয়ে পড়লেন—

মহারাজবাহাদুরও অধৈর্য্য হয়ে হাহাকার করতে লাগলেন। তাঁদের মেয়ে আর নাই—তাঁদের একমাত্র মেয়ে! কিন্তু কি ভাবে তাকে চুরি করে খুন করে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে? এখানে ঢুকবার গুপ্ত পথ নিশ্চয়ই আছে, সন্ধান করতে হবে। তিনি আবার নেমে গেলেন কূপের মধ্যে। বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন সেই কূপের দেওয়ালগুলো। না—দেওয়ালে কোনো ফাটল নেই; নিরাশ হয়ে উনি উঠে আসছেন; যে দড়িটা ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি কূপে নেমেছিলেন সেইটা আবার ধরবার জন্য লাফ দিলেন, কিন্তু দড়িটা ধরতে পরলেন না—কূপের মেঝেতেই সজোরে পড়লেন—ওঁর মনে হোল, যেন মেঝেটা ফাঁপা—হয়তো মেঝের তলায় গর্ত্ত আছে। ভালো করে আলো·নিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন মেঝেটা। হ্যাঁ—এক যায়গায় একটি বোতামের মত লোহার চাকা রয়েছে। বহু কষ্টেও সেটাকে নড়ান গেল না। তখন তিনি উপর থেকে স্ক্রু খুলবার যন্ত্র চেয়ে নিয়ে সেই ছোট নাট্‌টি ঘোরাতে লাগলেন। আশ্চর্য্য—গর্ত্তের মেঝেটা ক্রমশঃ একদিকে নামতে লাগলো এবং শেষ পর্য্যন্ত মিঃ শিকদার পিছলে পড়ে গেলেন অনেকখানা নীচে অন্য একটা গর্ত্তে।

অন্ধকার। নিজকে সামলে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আলো জ্বেলে দেখলেন, এখান থেকে একটা সিড়ি উপর দিকে উঠে গেছে—সেই সিড়ি বেয়ে উঠে এসে পৌঁছালেন ছাদের নীচে এবং সেখনেও কূপের তলার মত একটি নাট্‌ দেখতে পেলেন।

রেঞ্চ ঘোরাতেই সেটির এক পাশ নেমে উপরটা ফাঁকা হয়ে গেল—তিনি ইন্দিরার শয়নকক্ষ দেখতে পেলেন। তাহলে বোঝা গেল—এই পথেই ইন্দিরাকে চুরি করে হত্যা করে ঐ কূপের দোতালায় মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু কেন একাজ তারা করলো—এবং তারা এই গুপ্ত কূপে ঢুকলো কোন্ দিকে। মিঃ শিকদার আবার সিড়ি বেয়ে নেমে এলেন এবং কূপের শেষ অংশের চারদিক পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেওয়ালের গায়ে একটি নাট্! তিনি আবার রেঞ্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে লাগলেন নাট্-টি। অনেক্ষণ ঘোরানর পর হঠাৎ একখানা চৌকোনা পাথর নীচে নেমে গেল এবং ছোট গলির মত একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পাওয়া গেল। মিঃ শিকদার ঐ সুড়ঙ্গ পথেই চলতে লাগলেন। দীর্ঘ পথ, আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ—জল ঢোকার জন্য কাদা হয়ে রয়েছে; দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ—তবু তিনি চলছেন। প্রায় মাইল খানেক এসে দেখেন, রাস্তা বন্ধ—সেখানেও পরীক্ষা করে তিনি একটি নাট দেখতে পেয়ে সেটা খুলতে গিয়ে দেখলেন লেখা রয়েছে—

"মরাকে বাঁচাবার মন্ত্র আমরা জানি। যদি দশ লক্ষ টাকা দাও, তাহলে ঐ মৃতদেহ ইন্দিরার খাটের উপর শুইয়ে রেখো, আর তার বুকের উপর দশলক্ষ টাকার বিয়ারার চেক রেখ। সে চেক নিরাপদে ভাঙ্গানো হওয়ার পর আমরা মন্ত্রবলে ওকে বাঁচিয়ে দেব। সাবধান, কোনোরকম পুলিশী

হাঙ্গামা করলে মেয়ে তো বাঁচবেই না—তোমাদেরও বিপদ হতে পারে। ইতি

ন্যাংটা বাবাজী
মৃতসঞ্জীনী আশ্রম।
কামাখ্যামায়ীর মন্দির।

মিঃ শিকদার লেখাটা পড়লেন এবং কি করা উচিৎ, ভাবলেন। গলিত মৃতদেহকে আবার কেউ মন্ত্রবলে বাঁচাতে পারে, এরকম আজগুবি কথায় তিনি বিশ্বাস করলেন না। তাহলে দশ লক্ষ টাকা নিয়ে চোরেরা সরে পড়বার মতলবেই এই কথাগুলো লিখেছে। তারা হয়তো মেয়েটিকে চুরি করে সরিয়ে নিয়ে যাবার সময় কোনোরকমে মেরে ফেলেছে, তাই এখন তার মৃতদেহ দেখিয়ে তাকে বাঁচাবার কথা বলে টাকা আদায় করতে চায়। মিঃ শিকদার রেঞ্চ ঘুরিয়ে সে নাট্‌-টাও খুলে ফেললেন। একটি ঝরনার কিনারায় এসে পড়েছেন তিনি। চারিদিকে বন, পাহাড় আর তার মাঝে এই ঝরনাটি। এর জল বেশী হলে নিশ্চয় মিঃ শিকদারের আবিস্কৃত সুড়ঙ্গে ঢুকতে পারে যদি পাথরের দরজাখানা ভালরকমভাবে আঁটা না থাকে। উপরে উঠে মিঃ শিকদার ভাবতে বাগলেন—দশলক্ষ টাকার বেয়ারার চেক দিয়েই তিনি ব্যাপারটার পরীক্ষা করবেন নাকি? করলে মন্দ হয় না। মহারাজবাহাদুরকে জানাবার জন্য তিনি আবার ঐ সুড়ঙ্গ পথেই ফিরে এলেন, এবং মহারাজাকে

সব কথা বললেন। মহারাণী সাহেবা তৎক্ষণাৎ দশলক্ষ টাকার চেক লিখে দিতে অনুরোধ করলেন মহারাজাকে। শোকাতুর মহারাজাও রাজি, কিন্তু অত নগদ টাকা তাঁর ব্যাঙ্কে জমা নেই, তাই বললেন,—আমি পাঁচ লক্ষ টাকার চেক এখুনি লিখে দিচ্ছি,—বাকি অর্দ্ধেক পরে দেব, হাতে টাকা নেই। সেই ব্যবস্থাই ভাল, অর্দ্ধেক দিয়েই দেখা যাক না, কি ওরা করে, কেমন করে মেয়েটিকে বাঁচায়। মিঃ শিকদার সত্যিই পাঁচ লক্ষ টাকার বেয়ারার চেক লিখে সেই মৃতদেহটিকে ইন্দিরার বিছানায় শুইয়ে তার বুকে চেকখানি রেখে দিলেন। প্রথম রাত্রি কেটে যাওয়ার পর ওঁরা দেখলেন—মেয়েও বাঁচে নি, চেকখানাও ঠিক আছে। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রির পরেই ওঁরা দেখলেন, মেয়েটির মৃতদেহ মৃতই আছে, শুধু চেকখানি নেই, তার বদলে একখানি চিঠি—তাতে লেখা :—

প্রিয় রাজবাহাদুর, আপনার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা একদরের কারবারী। আর পাঁচ লক্ষ টাকা দিলে আপনার মেয়ে বাঁচবে। প্রথম কিস্তি বাবদ পাঁচ লক্ষ নিলাম।

ন্যাংটা সন্ন্যাসী—
মৃতসঞ্জীবনী আশ্রম।

মহারাজা আর পাঁচলক্ষ টাকা জনৈক ধনী মাড়োয়ারীর কাছ থেকে ধার নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, কিন্তু মিঃ শিকদার বললেন যে ও সব চিঠি স্রেফ ধাপ্পা। মরাকে কেউ বাঁচাতে

পারে না। অনর্থক আর টাকা নষ্ট করবেন না। ও টাকাও ওরা নিয়ে গিয়ে আরেকটা কিছু বলবে—বলবে যে মরা কখনও বাঁচে না।

মহারাণী কাঁদতে আরম্ভ করলেন এবং মহারাজাও বললেন যে যায় তো যাক আরো পাঁচ লক্ষ টাকা—তিনি শেষ চেষ্টাই করবেন। টাকা ধার নেওয়া হোল, এবং বৈকালে আবার একখানা বেয়ারার চেক লিখে মৃতদেহের বুকের উপর রাখবার জন্য যখন মহারাজাবাহাদুর ইন্দিরার শোবার ঘরে যাচ্ছেন; সেই সময় মিঃ শিকদার অমরের চিঠি পেলেন। অমর লিখেছে,

শিকার পুরের রাজকন্যা বেঁচে আছে, এবং আমি তাকে উদ্ধার করেছি! আপনি শীঘ্র মহারাজাবাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসুন—ব্যাপারটায় গভীর রহস্য রয়েছে! এখনো সব রহস্য উদঘটন হয় নি। ইন্দিরা ভাল আছে এবং মীনুর সঙ্গে খেলা করছে। ইতি—অমর।

মিঃ শিকদার মিনিটখানেক হতভম্ভ হয়ে রইলেন। তারপর বুঝতে পারলেন—ন্যাংটা সন্ন্যাসী অন্য একটা মৃত মেয়ের গলিত দেহ এই কূপের মধ্যে রেখে দিয়ে ওঁদের ধাপ্পা দিচ্ছিল। উঃ! কী শয়তান এই সন্ন্যাসী! কে এই শয়তান?

মহারাজাবাহাদুর আর মহারাণীকে তিনি সুসংবাদ দিলেন এবং জানালেন যে তাঁদের মেয়ে কলকাতায় বেশ নিরাপদ স্থানেই আছে।

রাত্রের ট্রেনেই ওঁরা কলকাতা রওনা হোলেন।

অমর কি ভাবে শিকারপুরের রাজকন্যাকে উদ্ধার করলো সেটা এবার বলতে হোল।

সেক্রেটারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অমর বাড়ী ফিরে ভাবতে লাগলো,—কী আছে ঐ লম্বামত বাক্সটায়! বাক্সখানা সাধারণ প্যাকিং বাক্স—লম্বা প্রায় অমরের নাক পর্য্যন্ত, হাত খানেক চওড়া আর ফুটখানেক উঁচু। ওর মধ্যে নিশ্চয় একটা চোদ্দ পনর বছরের মেয়েকে রেখে দেওয়া যেতে পারে। ওর এক পাশে যে কালো রেশমের মত বস্তুটি দেখে অমরের এই সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই কোন মেয়ের মাথার চুল! হয়তো শিকারপুরের রাজকুমারীর দেহ আছে ওর মধ্যে!

লালবাবুর বাড়ীতেই যে মানুষকে মৃতকল্প করে আবার ওষুধ দিয়ে বাঁচাবার ওষুদ তৈরী করা হয়—এটা তো সে এখুনি দেখে এল। লালবাবু তাহলে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত আছেন। লোকটি তো সোজা লোক নন? কিন্তু অমর ব্লাড্ ব্যাঙ্কারের পাল্লায় পড়ে বিন্ধ্যাচলের আরোগ্য নিকেতনে স্বচক্ষে দেখে এসেছে লালবাবুকে সমাধি দিতে। ঐ দিনই মিঃ শিকদার তাঁর গোপন ক্যামেরায় একটি মৃতদেহের ছবি তুলে নিয়েছিলেন, জানে অমর। সেই ছবিতেও লালবাবুর মৃতদেহেরই ছবি উঠেছিল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে—লালবাবু নিজেই ঐ

ওষুদের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করবার জন্য নিজেই মৃতকল্প হয়ে ওখানে সমাধিস্থ হয়েছিলেন, তারপর যথাসময়ে আবার জগুয়ার এবং ডাক্তার ওষুদ দিয়ে তাঁর সমাধি ভঙ্গ করেছে। কারণ লালবাবুকে আবার দেখে এসেছে অমর সেই কারখার উঠোনের নীচেকার মর্গে। বেশ সবল সুস্থই আছেন তিনি। অতএব দাঁড়ায় এই যে লালবাবুই এই রহস্যের নিয়ন্তা এবং তিনিই এদের পরিচালক।

যাইহোক, অমর ঠিক করলো, সন্ধ্যার পর সে গোপনে আবার যাবে লালবাবুর বাড়ী। সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করে রাখলো। লালাবাবুর বাড়ীর পিছন দিকে গলি রাস্তা, তারপর দত্ত মশাইদের দোতলা বাড়ী। ওঁদের বড় ছেলে অম্বিকার সঙ্গে অমরের জানা-চেনা আছে। অতএব সন্ধ্যার সময় অমর বেরুলো। বড্ড অন্ধকার, আর টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে; চোরের উপর বাটপাড়ি করবার চমৎকার দিন। অমর এসে অম্বিকাকে বললো, বিশেষ একটা গোপন তথ্য জানবার জন্য সে একবার এই বাড়ীর দোতালায় যেতে চায়।

অম্বিকা তৎক্ষণাৎ ওকে নিয়ে এলো দোতালায়। ওখান থেকে অমর দেখলো, লালবাবুর বাড়ীটা আঁধারে ডুবে রয়েছে। বিদ্যুতের চম্‌কানিতে সেই বড় কৃষ্ণ চুড়ার গাছটা দেখা যাচ্ছে আর সেই ভাঙা ষ্ট্যাচুটা। এ পাশে লোকজন কেউ নেই। অমর এসে অম্বিকাদের বাড়ীর এমন একটি জায়গায় দাঁড়ালো, যেখান থেকে কৃষ্ণচুড়ার গাছটা খুবই

কাছে হয়। রেশমের শক্ত দড়ির আগায় ছোট একটা ঢিল বেঁধে অমর সজোরে ছুড়ে দিল গাছটার মোটা একটা ডালের দিকে। দড়িটা ডাল পার হয়ে গেল, ঢিলটি ঝুলতে লাগলো,—অমর দড়ির অন্য প্রান্ত ধরে বারকতক হ্যাচ্‌কা টান দিয়ে দড়িটা হঠাৎ সজোরে টানলো, অমনি ঢিলটি মোটা ডালের গায়ে তিন চার পাক জড়িয়ে গেল। অমর অন্য প্রান্ত টেনে দেখলো দড়িটি বেশ জোর আটকে গেছে। অমর তার হাতের দড়ির প্রান্তটা অম্বিকাদের দোতালার রেলিংয়ে বাঁধলো। তার পর অম্বিকাকে কয়েকটি উপদেশ দিয়ে সেই দড়ি ধরে আকাশ পথে চলে এলো কৃষ্ণচুড়া গাছটার উপর। অম্বিকা নিশ্বাস বন্ধ করে অমরের কাণ্ড দেখছিল। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকার জন্য ওরা এখন অল্প দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু অমর গাছে এসেই দেখতে পেল—নামবার উপায় নেই। দুটি বড় বড় কুকুর বাগানের চার দিকে ঘোরা ফেরা করছে। নামলেই অমরকে ছিঁড়ে ফেলবে। অমর ভূতের মত বসে রইল গাছের উপর। অনেকক্ষণ বসে রইল। ওর সৌভাগ্যই বলতে হবে। কে যেন কুকুর দুটোকে ডাক দিল, বললো,—ভোলা, কেলো, আয়, খেয়ে যা...চু—চু—চু···চু!

দুটো কুকুরই চলে গেল। এই কয়েক মিনিটের সুযোগ! অমর টুপ্‌করে নেমে পড়লো গাছ থেকে একেবারে বাড়ীর উঠোনে। তারপর এসে দাঁড়ালো সেই গুদাম ঘরটার বন্ধদরজার কাছে। তালাবন্ধ দরজা। কিন্তু অমর তৈরী হয়েই

এসেছিল। পরপর চার পাঁচটা চাবি ঘুরিয়ে সে তালা খুলে ফেললো,—সামনেই সেই প্যাকিং বাক্সটি।

সময় নিতান্ত অল্প তার হাতে, অমর দ্বিধামাত্র না করে বাক্সটি তুলে নিল। বেশ ভারী বাক্সটি। কিন্তু অমর গ্রাহ্য করলো না, চলে এলো বাইরে। এখন আবার তাকে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের উপর উঠে তবে এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কুকুর দুটো আসছে। অমর চটকরে সেই ভাঙা ষ্ট্যাচুটার আড়ালে দাঁড়ালো। ষ্ট্যাচুটা ভাঙা। কিন্তু ওটা যে বেদিতে বসানো ছিল, সেটার মধ্যে গর্ত্ত রয়েছে অনেকটা। অমর হাতের বাক্সটি সেই গর্ত্তে নামালো, নিজেও নামলো। গর্ত্তে নেমে ওর খুব সুবিধে হয়ে গেল। কুকুরগুলো ওকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ ও তাদের দেখতে পাচ্ছে। অমর ইতিমধ্যে নিজের পিঠের সঙ্গে বাক্সটি ভাল করে বেঁধে ফেললো।

কুকুর দুটো কি যেন শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে, হয়তো অমরেরই পায়ের গন্ধ। এখুনি হয়তো ধরে ফেলবে অমরকে। অমর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলো—কুকুর দুটো কৃষ্ণচূড়ার গাছতলা থেকে মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে গেল গুদাম ঘরের ভেতর—অমর ঘরের দরজা বন্ধ করে আসেনি। ওরা ঘরে ঢুকেও হয়তো শুঁকছে। অমর ইতিমধ্যে চটকরে বেরিয়ে মুহূর্ত্তে এসে কৃষ্ণচূড়া গাছটায় উঠে পড়লো। তারপর দড়ি ধরে আকাশ পথে দুলতে দুলতে চলতে লাগলো। ওদিকে কুকুর দুটো চীৎকার আরম্ভ করেছে। এখুনি ঐ দস্যুদের কেউ না কেউ এসে

জানতে পারবে যে বাক্সটি চুরি হয়েছে ; কিন্তু অমর একটু বিচলিত হলেই পড়ে যেতে পারে। সে অতি সাবধানে এসে উঠলো অম্বিকাদের বাড়ীর দোতালার বারান্দায়। অম্বিকা তৎক্ষনাৎ ধরে টেনে নিল ওকে। অমর সর্ব্বাগ্রে রেশমের দড়িটা রেলিং থেকে খুলে খুব টান করে ছেড়ে দিল, সেটা গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছেই জড়িয়ে গেল। অমর ঢুকলো অম্বিকার পড়বার ঘরে। বাক্সটা খুলে নামিয়ে সে বসে জিরুতে লাগলো।

ওদিকের বাড়ীতে তখন কুকুর আর মানুষে মিলে কী দারুণ খোঁজা খুঁজিই না চলছে! অমরকে পেলে এখুনি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে ওরা ; কিন্তু অমর সেয়ানা ছেলে। সে প্রথম পকেট থেকে প্যাকিং বাক্সখোলা সাঁড়াশীটা বের করে বাক্সটি খুলে ফেললো—অশ্চর্য্য ব্যাপার, একটি মেয়ে!

মেয়েটি মরে গেছে মনে হয়, কিন্তু অমর জানে, ও মরেনি। ওর গলায় একটি লেবেল ঝুলছে, তাতে লেখা—"মঙ্গলবার রাত্রি বারোটার পর এক নম্বর ইন্‌জেকসন দাও, তারপর রাত্রি একটার সময় দু'নম্বর ইন্‌জেকসন। দুটোর মধ্যে চোখ মেলে তাকাবে ; তখন আস্তে আস্তে লাল মৃত-সঞ্জীবনী খাওয়াও—তিনটার মধ্যে ঘুমিয়ে যাবে।"

অমর এ কায়দা জানে এবং ওষুদও সে যোগাড় করে এনেছিল যখন মীনুকে এরা চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু রাত্রি বারোটা বাজতে এখনো দেরী আছে। অম্বিকাদের বাড়ী থেকে

অমর থানায় টেলিফোন করলো, বললো, এখনি যেন অমরকে পুলিশের পাহারায় বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হয় আর লালবাবুর বাড়ী পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করা হয়। ওবাড়ীতে অনেক রহস্য আছে! অমর অবশ্য পুলিশের লোক নয়, কিন্তু মিঃ শিকদার তার নিকট আত্মীয়, এবং অমরকে থানার সকলেই চেনেন, তাই তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থায় অমরকে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিলেন তাঁরা। মেয়েটিকেও অমর নিয়ে এল কোলে করে। বাড়ী এসে ঠিক রাত বারটার সময় সে নিজেই দিল ইন্‌জেক্‌সন। ইন্‌জেকসন দিতে ও এই ক'দিনে শিখেছে। তারপর রাত একটায় আবার দিল ইন্‌জেকসন; ঠিক দুটোর মধ্যে মেয়েটি চোখ মেললো, এবং লাল ওষুদ খেয়ে আবার ঘুমিয়ে গেল। অমরও শুলো একটু। আনন্দে ওর আজ ঘুম হবার কথা নয়, কিন্তু তবু ঘুমিয়ে গেল।

উঠেই অমর দেখতে গেল ইন্দিরাকে। সে জেগেছে। মীনু আর তার মা ওকে কিছু হরলিকস্‌ খাইয়েছেন। আস্তে কথা বলতে পারছে ইন্দিরা। সকাল বেলা ও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। অমরও চিঠি লিখে দিল মিঃ শিকদারকে; তারপর ইন্দিরার কাছে প্রশ্ন করে জানলো যে, ডাঃ লালবিহারী চৌধুরী নামক একজন ধনী ডাক্তার শিলংএর বাড়ীটা ওর বাবাকে বিক্রী করেন। বাড়ী খরিদ করার পর মহারাজা-বাহাদুর পত্নী এবং কন্যাকে নিয়ে ওখানে আসেন স্বাস্থ্য লাভ করবার জন্য। সেই সময় ঐ ডাক্তারের ক্লিনিকের একজন নার্স,

নাম নীলিমা দেবী, মাঝে মাঝে আসতেন রাজাবাহাদুর এবং তাঁ
রাণীমার খবর নেবার জন্য। ডাক্তার শিলং ছেড়ে কলকাতায় অ
চলে এলেও নীলিমা দেবী শিলংএ থেকে যান। সে সময় আ
তিনি কোনো চাকরী করছিলেন না, প্রাইভেট প্র্যাকটিস ই
করছিলেন। মহারাজাবাহাদুরের জিনিষপত্র যেদিন দেশের
বাড়ী থেকে এসে পৌঁছায়, এবং বাড়ী গোছানো হয়, ব
সেই দিনও নীলিমা দেবী মহারাণীকে বাড়ী গোছাবার কাজে অ
সাহায্য করেছিলেন, ইন্দিরার শোবার ঘরখানাও নিজে গুছিয়ে ব
দেন এবং বহু রকম সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। মহারাজা প
অসুস্থ, তাই নার্স নীলিমা দেবীকে ওঁরা বিশেষ খাতির করতেন।
বাড়ী গোছানো শেষ হবার পর নীলিমা দেবী চলে যান নিজের ব
ঘরে; তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। ঐ দিনই রাত্রে মহারাজা তাঁর
পিতামহের আমলের কাঠের ক্যাসবাক্সটি, যে বাক্সটি তিনি গ
নিত্য ব্যবহার করেন, এবং অত্যন্ত জরুরী জিনিষপত্র রাখেন, এ
সেটি খুলে দেখতে পান যে তাঁর পিতামহের আমলের প্রাচীন মা
পুঁথীটি বাক্সতে নেই। পুঁথীখানিতে কী আছে, মহারাজ ক
জানেন না। কিন্তু তাঁর পিতামহ বিশেষ যত্ন করেই সেটি ঐ
বাক্সে রক্ষা করতেন। মহারাজাবাহাদুর বিশেষ দুঃখিত হন ত
পুঁথীখানি হারিয়ে যাওয়াতে। কিন্তু কাউকেই সন্দেহ করার ম
মত কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না, কারণ, সাধারণ কেউ ও পুঁথী
নিয়ে বিশেষ কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। যাই
হোক, পরদিন নীলিমা দেবী এসে জানান যে কলকাতা থেকে

তাঁর পুরানো মনিব ডাঃ চৌধুরী তাঁকে যেতে লিখেছেন, অতএব আজই তিনি কলকাতা যাচ্ছেন। এরপর নীলিমা দেবীর আর কোনো খবর পান নি ওঁরা। কিন্তু· ·কথা বলতে বলতে ইন্দিরা থামলো।

—বলো।—অমর উৎসাহ দিল ওকে। ইন্দিরা আবার বলতে লাগলো,—তারপর বছরখানেক কোনো কিছু ঘটে নি। আমাকে চুরি করে আনার পরেই বোধ হয়, সময় ঠিক করে বলতে পারবো না—অন্ধকার একখানা ঘরে আমি পড়েছিলাম, হাত-পা নাড়তে পারছিলাম না, কিন্তু ভেতরে যেন জ্ঞান হয়েছিল আমাব। শুনতে পেলাম, কে একজন বলছে—পুঁথীখানা দাও, তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি। এটা পুরুষের গলার স্বর, কিন্তু তার উত্তরে মেয়েলি গলায় কে যেন বললো—'লক্ষটাকার কম আমি ও পুঁথীর একটা পাতাও দেব না। ডাক্তার জানতে পারলে আমার মাথা আর ঘাড়ে থাকবে না—জানো তো। লক্ষটি টাকা ফ্যালো—পাতাখানি এনে দিচ্ছি।'

কথাগুলো শুনে আমি তখন কিছু বুঝতে পারি নি, কিন্তু তারপরই আমার অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলে উঠলো, আর আমি দেখতে পেলাম, একজন খুব জোয়ান পুরুষ আর নার্স নীলিমা দেবী কথা বলছে। আমি ভাল করে নীলিমাকে দেখছিলাম, হঠাৎ ওরা জানতে পারলো যে আমার জ্ঞান ফিরেছে ; তখুনি কি একটা খাইয়ে আমাকে আবার অজ্ঞান

দিয়েছেন, তাঁকে অমর অবশ্য বলেছিল জাগুয়ার আর ডাক্তারের কথা। কিন্তু তাহলে কি কিউকাকা আর লালবাবু একই লোক? আশ্চর্য্য তো!

অমব বাড়ী ফিরে এল। রাজকুমারীকে সে খুব সতর্ক পাহারায় রেখেছে। পরদিন এলেন মিঃ শিকদার রাজাবাহাদুর আর রাণীমাকে সঙ্গে নিয়ে। মেয়েকে পেয়ে কী যে তাঁদের আনন্দ! অমরকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করলেন ওঁরা। মিঃ শিকদার অমরকে বললেন—সাবাস! তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত ক'রে রেখে যাব।

রাত্রি দশটায় লালবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে যাবে কি না, ভেবে অমব মিঃ শিকদার এবং ছদ্মবেশী জনপাঁচেক পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হোল। গেট খোলা, নীচেয় কেউ নাই, কিন্তু দোতালায একটা ঘরে আলো জ্বলচে। মিঃ শিকদার অমরকে নিযে তাড়াতাড়ি উঠছেন। কথা শোনা যাচ্ছে।

"বিশ্বাসঘাতকতার এই পুরস্কার"—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম! তিনটা আওয়াজ হোল, ছুটে এসে ওঁরা দেখলেন, তিনটি লাস পড়ে আছে। ডাক্তার, জাগুয়ার আর নীলিমা। বাড়ীখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও লালবাবু বা আর কোনোলোকের দেখা পাওযা গেল না। শূন্য বাড়ীখানা খাঁ খাঁ করছে। অমর আর মিঃ শিকদার লালবাবুকে গ্রেপ্তার করতে না পেরে হতভম্ব হযে গেলেন। *

---

* পববর্ত্তী বই "কালো রুমাল"—এই বইএ অমর পুরো দস্তুর গোয়েন্দা হয়ে উঠবে আর ডাঃ কিউএর সঙ্গে হবে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।